হাতিয়া
গণহত্যা

মিঠুন সাহা

১৯৭১
গণহত্যা ও নির্যাতন
আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা : ১২

গ্রন্থমালা সম্পাদক
মুনতাসীর মামুন

সহযোগী সম্পাদক
মামুন সিদ্দিকী

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২১/মার্চ ২০১৫

হাতিয়া গণহত্যা [Hatia Genocide]

©
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
[1971 : Genocide-Torture Archive & Museum Trust]
বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী
[Bangladesh History Congress]

প্রকাশক
১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট
৩৩৪ শের-এ-বাংলা রোড, ময়লাপোতা মোড়, খুলনা ৯১০০
itihassammilani.bd@gmail.com, archivemuseum1971@gmail.com
০১৮১৬২৮৮৬৭৪, ০১৭১৫৪৫৭৩৮২, ০১৭১১২১৭১১১

মুদ্রণ
ওয়ান স্টপ প্রিন্টশপ, ৬০/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থ নকশা ও প্রচ্ছদ
তারিক সুজাত

পরিবেশক
জার্নিম্যান বুকস্ ও সুবর্ণ

মূল্য : ১৫০ টাকা

ISBN : 000 000 0000 0

দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড প্রদত্ত অনুদানের
সহায়তায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে

গ্রন্থমালা প্রসঙ্গে

মুক্তিযুদ্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য গণহত্যা-নির্যাতন। একের অধিক মানুষ হত্যাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে গণহত্যা হিসেবে। নির্যাতনের অন্তর্গত শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করা। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বগাথা সবচেয়ে বেশি আলোচিত এবং তা স্বাভাবিক। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোনো একটি দেশে এতো অল্প সময়ে এতো হত্যাও হয়নি। যদিও আমরা বলি ৩০ লক্ষ শহীদ হয়েছেন কিন্তু মনে হয় সংখ্যাটি তারও বেশি হবে। গণহত্যা, বধ্যভূমি, নির্যাতন মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে একেবারে নেই তা নয় কিন্তু গুরুত্ব ততোটা এর ওপর দেয়া হয়নি। যে কারণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগের ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। কিন্তু ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে গণহত্যা হয়েছিল তার ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র, সাহিত্য, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে এখনও সেই গণহত্যার কথা ফিরে আসে। যে কারণে ইউরোপে ফ্যাসীবাদ আর নাজিবাদ জায়গা করে নিতে পারেনি। আমাদের এখানে তা হয়নি দেখে গণহত্যার সংখ্যা নিয়ে এখনও অনেকে প্রশ্ন করার সাহস রাখেন এবং হত্যাকারীদের সমাজ ও রাজনীতিতে এমনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে তারা একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশে সামরিকবাদ, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ আবারও শেকড় গেড়েছে।

এ দেশে গণহত্যা-নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর রাজাকার, আল-বদর, শান্তি কমিটির সদস্যরা। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ থেকেই মূলত এসব বাহিনীতে গেছে কর্মিরা। সুখের বিষয়, এসব মানবতা-বিরোধীদের বিচার শুরু হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে।

দেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর। নির্যাতনের শিকার বহু নারী-পুরুষ এখনও রোমহর্ষক স্মৃতি রোমন্থন করেন। সেসব গণহত্যার বৃত্তান্ত, বধ্যভূমি ও গণকবরের কথা, এমনকী নির্যাতনের কথা বিজয়ের গৌরব-ভাষ্যে উপেক্ষিত থেকে গেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায়, অনুপুঙ্খ ইতিহাস অনুসন্ধানে এসবের গুরুত্ব অপরিসীম। গণহত্যা, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সংগ্রহশালা তৈরি আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসার পাশাপাশি উত্তরপ্রজন্মের মাঝে মুক্তিসংগ্রামের মর্মবাণী প্রতিভাত হবে। এই তাগিদ থেকে গড়ে ওঠেছে '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট'। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যা, বধ্যভূমি, গণকবর ও নানামুখী নির্যাতনের দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ এবং জাতির সামনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকথা তুলে ধরা। এর পাশাপাশি একটি অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, শোষণমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণের বাণী প্রচার করা এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ।

এরই আলোকে এ যাবৎকালে প্রাপ্ত গণহত্যা ও বধ্যভূমির ওপর ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি গণহত্যার ইতিবৃত্ত তুলে ধরা '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি পুস্তিকা লেখকের স্বকীয়তা বজায় রেখেও নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রণীত হবে। এর বিষয়-বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান, তৎকালীন অবস্থা, গণহত্যার পটভূমি, গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ, শহীদ ও নির্যাতিতদের নাম-পরিচয়, ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীর মৌখিক ভাষ্য, গণহত্যায় জড়িতদের নাম-পরিচয়, বধ্যভূমি সংরক্ষণের প্রয়াস, বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক মূল্যায়ন। প্রতিবেদনধর্মী হলেও পুরো কাজটি গবেষণামূলক। উল্লেখ্য, গণহত্যায় সব শহীদের নাম কোথাও পাওয়া যায় না। এখানে প্রতিটি গণহত্যায় যে কজনের নাম পাওয়া গেছে শুধু তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থে অনেক আলোকচিত্র/শিল্পীদের চিত্রকর্মের প্রতিলিপি ব্যবহার করা হয়েছে, যা নেয়া হয়েছে অন্তর্জাল ও বিভিন্ন বই থেকে। মুক্তিযুদ্ধের ছবি যেহেতু জনস্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে জন্য কখনও কেউ আপত্তি তোলেননি। শিল্পী ও আলোকচিত্রিদের ঋণ আমরা স্বীকার করছি।

এ কাজের স্বাতন্ত্র্য এখানে যে, লেখক গণহত্যা ও বধ্যভূমির স্থলে সরেজমিনে গিয়ে, খোঁজ-খবর নিয়ে, গণহত্যা সংশ্লিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে, পর্যবেক্ষণ করে– সেই অশ্রু-শোণিতের দিনগুলিকে অন্তরে অনুভব করে তবেই প্রণয়ন করেছেন এই ভাষ্য। সবার হৃদয় নিংড়ানো কথামালা যেন এখানে মেলে ধরেছে ভয়াল দিনের স্মৃতি। ফলে এর মধ্য দিয়ে যে সেই গণহত্যা ও নির্যাতনের কথা অকৃত্রিমরূপে উঠে এসেছে– এ ভরসা আমরা করি।

বর্তমান পুস্তিকা *হাতিয়া গণহত্যায়* কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলাধীন হাতিয়ায় সংঘটিত গণহত্যা-নির্যাতনের বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম.ফিল গবেষক মিঠুন সাহা। নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করেও তিনি হাতিয়া গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি এর বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করেছেন। আমাদের এই প্রয়াসে যুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যা-নির্যাতন, বধ্যভূমি ও গণকবর সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চায় এ গ্রন্থমালা বিশেষ আলো ফেলবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে শুধু গৌরব নয়, মুক্তিযুদ্ধের বেদনাবিধুর কাহিনী তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উঠে আসবে। এই বেদনা ও গৌরবের কাহিনী বয়ানের মাধ্যমে মানবতার জয়গান করে সম্প্রীতির সমাজ নির্মাণ আমাদের লক্ষ্য। মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শও তো তাই।

মুনতাসীর মামুন
গ্রন্থমালা সম্পাদক

ভূমিকা

গণহত্যা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অপরাধ। গ্রিক শব্দ Genos এবং ল্যাটিন শব্দ Cide যুক্ত করে গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Genocide শব্দের উৎপত্তি। Genos অর্থ হচ্ছে জাতি, শ্রেণি, সেক্স আর Cide অর্থ হত্যা [যেমন : হোমিসাইড, ফ্রাস্টিসাইড ইত্যাদি]। আন্তর্জাতিক আইনে Genocide বা গণহত্যা কথাটির অর্থ হলো– কোন সরকার দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় দলভুক্ত জনগণের বিনাশ করা।

গণহত্যা সুপ্রাচীনকাল থেকে সংঘটিত হয়ে এলেও গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Genocide অভিধানটি একান্তই হাল আমলের বলা চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাফায়েল লেমকিন প্রথম এই অভিধাটি ব্যবহার করেন। কেউ কেউ Genocide-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে গণহত্যার বিকল্পে জাতিহত্যা, নৃ-হত্যা, জাতিবিনাশ, জাতিবিন্যাশজ্ঞ হিসেবে ব্যবহার করতে আগ্রহী। Genocide বলতে যথেচ্ছ হত্যা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে হত্যা, গোষ্ঠীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার পদপিষ্ঠ করা– যা এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বটে। জেনোসাইড বা গণহত্যা বলতে কী বোঝায় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জাতিসংঘের একটি কনভেনশনে। কনভেনশন অনুযায়ী গণহত্যার সংজ্ঞা ও পরিধি নিম্নরূপ : ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজুলেশন ২৬০ (৩) এর অধীনে গণহত্যা এমন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় যা বিশ্বময় প্রতিরোধে সকল রাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। এই গণহত্যা বলতে বুঝায় এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা কেবল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ২৬০ (৩) এর অনুচ্ছেদ-২ এর অধীন যে কর্মকাণ্ডকে আইনগতভাবে গণহত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা হল :

ক. পরিকল্পিতভাবে একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তাদের সদস্যদেরকে হত্যা বা নিশ্চিহ্নকরণ।

খ. তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতি সাধন।

গ. পরিকল্পিতভাবে একটি জাতিকে ধ্বংস সাধনকল্পে এমন জীবননাশী অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে তারা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ঘ. এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাতে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর জীবনধারণে শুধু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি নয়, সেই সাথে তাদের জন্ম প্রতিরোধ করে জীবনের চাকাকে থামিয়ে দেওয়া হয়।

ঙ. একটি জাতি বা গোষ্ঠীর শিশু সদস্যদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে তাদের জন্ম পরিচয় ও জাতিগত পরিচয়কে মুছে ফেলাকেও গণহত্যা বলা হয়।

'১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে কোন গণহত্যা চালায়নি'– এমন একটি দাবি পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তৎকালীন পাকিস্তানি প্রশাসন ও এদের সমর্থকগোষ্ঠী সবসময় করে থাকে। আসুন দেখি, পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলো তাদের ঐ দাবিকে সমর্থন করে কি-না।

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারগণ একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকেই পূর্বে প্রণীত 'অপারেশন বিৎস' সংশোধন করে আরও ধ্বংসাত্মক 'অপারেশন সার্চলাইট' এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এ পরিকল্পনা বাদেও ইয়াহিয়া বলছেন, "Kill three million of them, and the rest will eat out of our hands"[১], নিয়াজির ভাষায়, "আমরা পূর্ব পাকিস্তানের জাতিগত পরিচয় বদলে দেব"[২], রাও ফরমান আলীর ডায়রি অনুযায়ী "সবুজ পূর্ব পাকিস্তানকে লাল রঙে রাঙাতে হবে"[৩], 'বালুচিস্তানের কসাই' খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানের ভাষায়, "এদেশের মানুষ চাই না, মাটি চাই"[৪]।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন শীর্ষ নেতৃত্বের উল্লিখিত বক্তব্যগুলো খুব পরিষ্কারভাবে দেখায়, বাংলাদেশে কী মাপের গণহত্যা ও ধ্বংসলীলা চালানোর পরিকল্পনা তাদের ছিল। হাতিয়া গণহত্যা পাকিস্তানি বাহিনীর হিংস্রতা, বর্বরতা ও পাকিস্তানি বিকতার মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। এমন দৃষ্টান্ত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশে ১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে কত সৃষ্টি করেছিল, তার হিসাব আজও মেলেনি।

সুপ্রিয় পাঠক, লেখার শুরুতে গণহত্যার যে সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখন সর্বজন স্বীকৃত। সংজ্ঞাটি উল্লেখ করার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, পাঠক যাতে ১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলাধীন হাতিয়া ইউনিয়নে পাকিস্তান বাহিনী ও তাদের এদেশীয়

দোসরদের দ্বারা সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ড আসলে গণহত্যা ছিল কি-না তা বিচার করে দেখার সুযোগ পান।

হাতিয়া গণহত্যার পরিধি হাতিয়া ইউনিয়নের দাগারকুটি, অনন্তপুর, বাগুয়া, রামখানা, নয়াডোরা, নীলকণ্ঠ ও সন্নিহিত গ্রামগুলো। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের কলাকাটা, জলংগারকুটি, ফকির মোহাম্মদসহ কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই জঘন্য গণহত্যার শিকার হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রায় দশ ঘণ্টার হামলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকাররা অন্তত ৬৯৭ জন নিরীহ, নিরস্ত্র গ্রামবাসীকে হত্যা করে। তারা অকথ্য নির্যাতন চালায় অগণিত নারীর উপর। যেহেতু হাতিয়া ইউনিয়ন ও বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন তাদের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং হাতিয়া ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে বিশেষ করে দাগারকুটি গ্রামটিতে নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল তাই স্থানীয় লোকজন এটিকে হাতিয়া গণহত্যা বলেন।

হাতিয়া ইউনিয়ন ব্রহ্মপুত্র, ধরলা বিধৌত প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং সীমান্তবর্তী হওয়াতে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে এখানকার সাধারণ মানুষ দেশের অভ্যন্তরেই অবস্থান করছিল। তারা কল্পনাও করতে পারেনি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এত প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আসবে এবং তারা এমন বীভৎস নির্যাতন চালাবে। তবে, মুদ্রার অপর পিঠের অবস্থা হল, এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল এবং এ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে মুক্তিবাহিনীর বেশ কতক ক্যাম্প ছিল। এর চেয়েও যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হল স্থানীয় মানুষজন স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সহযোগিতা করছিল। আর এ কারণেই, পাকিস্তানি বাহিনী এখানকার বাঙালি নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে 'নসল বদলে' দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়।

হাতিয়া গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়নি। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘটনা হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের লেখনী ও গণমাধ্যমে এর কোন উল্লেখ ও আলোচনা নেই। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* গ্রন্থেও এই গণহত্যার কোন উল্লেখ নেই। ১৯৭১-এর গণহত্যা নিয়ে লিখিত অনেক গ্রন্থেও এ বিষয়টি অনুল্লিখিত। অবশ্য তাজুল মোহাম্মদ প্রণীত *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম* এবং হারুন হাবীব সম্পাদিত *বাংলাদেশ ১৯৭১ : গণহত্যা প্রতিরোধ স্বাধীনতা* গ্রন্থদ্বয়ে হাতিয়া গণহত্যা প্রসঙ্গে কিছু লেখা পাওয়া গেছে।

এটা ঠিক যে মুক্তিযুদ্ধের এত বছর পর গণহত্যা, নির্যাতনের বস্তুনিষ্ঠ ভাষ্য তৈরি করা দুঃসাধ্য। মুক্তিযুদ্ধকালে আক্রান্ত ব্যক্তি, প্রত্যক্ষদর্শী ও অন্যান্য প্রামাণিক দলিল বা ইতিহাসের উপকরণ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। তবে, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এবং বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর উদ্যোগে '১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন নির্ঘণ্ট গ্রন্থমালা'র মাধ্যমে সারাদেশে অনালোচিত ও যথাযথ গুরুত্ব না পাওয়া স্থানীয় গণহত্যার ইতিহাস যথার্থভাবে সংরক্ষণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই প্রয়াসের সাথে যুক্ত হতে পেরে গর্ব বোধ করছি।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসর, রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌সদের দ্বারা বাংলাদেশ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়েছে। নৃশংস গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষ, বর্বরোচিত নির্যাতনে সম্ভ্রম হারিয়েছে অগণিত মা-বোন। সেই বিভীষিকাময় গণহত্যাযজ্ঞের বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক ইতিহাস এ দেশের নতুন প্রজন্মকে জানাতে হবে। শুধু এখানেই শেষ নয়, সে ইতিহাস বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের চেতনায়, মানসে ও অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা বাঙালি হিসেবে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। 'হাতিয়া গণহত্যা' সেই দায়িত্ববোধের ক্ষুদ্র প্রয়াসমাত্র।

হাতিয়া গণহত্যার তথ্য সরেজমিনে সংগ্রহকালে আমি অডিও রেকর্ডার ও ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। এ গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ভুক্তভোগী, প্রত্যক্ষদর্শী, এই গণহত্যা নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করা স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ প্রজন্মের অনেকের সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকারই এই পুস্তিকার ভিত্তি।

হাতিয়া গণহত্যা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণাদাতা আমার শিক্ষক বরেণ্য ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণার এই দিকপালের প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। এরপর স্মরণ করছি মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ মিজানুর রহমানের অবদান। সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহকালে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা পেয়ে আমি সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মনসুর আলী ও মোঃ শামসুল আলম ছিলেন আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। এই বীর সন্তানদ্বয়ের প্রতি আমার ঋণ অসীম।

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মিঠুন সাহা
msaha306@gmail.com

ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার একটি কুড়িগ্রাম। সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গের জেলা হিসেবে পরিচিত কুড়িগ্রাম ২০১০ সালের পূর্বে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই জেলাটি রংপুর বিভাগের অন্তর্গত। ২০১০ সালের ৯ মার্চ বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলের ৮টি জেলাকে রাজশাহী বিভাগ থেকে আলাদা করে রংপুর বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ভারতীয় সীমান্তের প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিস্তৃত এই কুড়িগ্রাম ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, ফুলকুমারসহ অসংখ্য নদ-নদীর বাঁকে বাঁকে গড়ে উঠেছে।

বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলা প্রাচীনকালে কামরূপ ও গৌড়বর্ধন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অনার্য প্রধান এ দুটি রাজ্যে কোল, ভিল, গারো, কোচ, মেচ, হাজং, রাজবংশী, কিরাত, কুকি, ভুটিয়া প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। মূলত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয়দের মিলিত রক্ত ধারায় গড়ে ওঠা সেই জনপদের একটি অংশ আজকের কুড়িগ্রাম জেলা। এ জেলার মানুষের চেহারা, আকৃতি, ভাষা এবং আচার-আচরণে এখনো বিদ্যমান রয়েছে অনার্য মানুষের বৈশিষ্ট্য।

১৯৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশকৃত কুড়িগ্রামে বর্তমানে ৯টি উপজেলা। উপজেলাগুলো হচ্ছে কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, উলিপুর, রাজারহাট, রাজীবপুর, রৌমারী, চিলমারী।

উলিপুর উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এটি আয়তনের দিক থেকে জেলার সর্ববৃহৎ বড় উপজেলা। এ উপজেলার উত্তরে কুড়িগ্রাম সদর ও রাজারহাট উপজেলা, দক্ষিণে চিলমারী ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে রৌমারী উপজেলা ও ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে রংপুরের পীরগাছা উপজেলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা। এ উপজেলা প্রায় ২৫°৩৩" ও ২৫°৫০" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৩১" ও ৮৯°৫১" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলা শহর কুড়িগ্রাম হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৮ কি.মি। এর আয়তন প্রায় ৪৫৮ বর্গ কি.মি। তন্মধ্যে নদী প্রায় ৭৬.৬৪ বর্গ কি.মি, চরাঞ্চল প্রায় ১৪.৪০ বর্গ কি.মি. এবং জলাশয় প্রায় ০.৭২ বর্গ কি.মি। এ উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের একটি হাতিয়া। উপজেলা সদর হতে পূর্ব দিকে প্রায় ৯ কি.মি দূরত্বে এর অবস্থান। এ ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ৩৫ বর্গ কি.মি। হাতিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণে

বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন, উত্তরে চিলমারী উপজেলা, পূর্বে সাহেবের আলগা ইউনিয়ন ও পশ্চিমে ধরণীবাড়ি ইউনিয়ন এবং ধামশ্রেণী ইউনিয়ন অবস্থিত ।

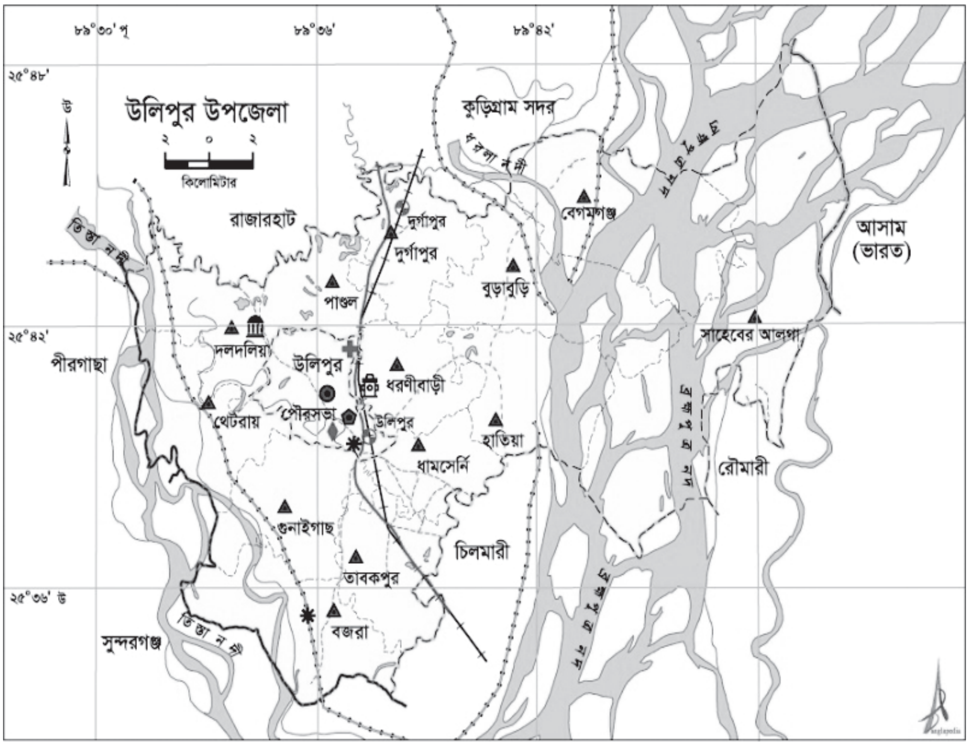

উলিপুর উপজেলার মানচিত্র *বাংলাপিডিয়ার সৌজন্যে*

স্থানটির তৎকালীন অবস্থা

হাতিয়া ইউনিয়ন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৩ সালে। ১৯৭১ সালে হাতিয়া ইউনিয়ন ছিল কুড়িগ্রাম মহকুমার উলিপুর থানাধীন। এ অঞ্চলে মুসলীম লীগের বেশ প্রভাব ছিল। মুসলীম লীগের নেতা ও সাবেক ডেপুটি স্পিকার আবুল কাসেম এ অঞ্চল থেকেই নির্বাচিত হতেন। এছাড়া, জামায়াতে ইসলামীও শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। তবে, ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয়-দফা ঘোষণা এতদ্ অঞ্চলের মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ফলে এই এলাকার মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজ আওয়ামী লীগের রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এখানকার মানুষ সাহসী ও সংগ্রামী। 'ফকির বিদ্রোহ', 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' 'প্রজা বিদ্রোহ' সহ সবকটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এ অঞ্চলের মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পর আসে পশ্চিম পাকিস্তানি দুঃশাসন। পশ্চিমা শাসকচক্র বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত আনলে সে চক্রান্তের বিরুদ্ধে সারাদেশের মত এই এলাকার মানুষও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর সংঘটিত প্রত্যেকটি পশ্চিমা বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে এ এলাকার অংশগ্রহণ স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৭০-এর দশকে এই এলাকার মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি কাজ। সাধারণত, দুই ফসলি কৃষি উৎপাদন ছিল এই এলাকার কৃষির বৈশিষ্ট্য। ধান, গম, পাটই ছিল মূল কৃষিজ উৎপাদন। এর বাইরে ক্ষুদ্র আকারের জেলে সম্প্রদায়ের বাস ছিল। কৃষি নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এখানকার বেশির ভাগই ছিল ক্ষুদ্র কৃষক আর ভূমিহীন কৃষক, যারা কৃষি শ্রমিক হিসেবে বৃহৎ কৃষকের জমিতে শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। তৎকালে এ অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যৌথ পরিবার। তবে, এখন একক পরিবারের প্রতি ঝোঁক তুলনামূলক বেশি। সমাজে প্রবীণদের প্রভাব ছিল। সামাজিক নেতৃত্বের মাপকাঠি ছিল সম্পদ, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ। বর্তমানে সব ধরনের নেতৃত্ব রাজনীতিকদের হাতে।

'৭০-এর দশকে হাতিয়া ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল প্রায় চৌদ্দ হাজার। এখানকার অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান এবং অবশিষ্ট প্রায় ২০ শতাংশ ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। এ অঞ্চলে শিক্ষার হার ছিল অনেক কম। উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল হাতে গোনা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অথচ, এ এলাকার মানুষ রাজনীতি সচেতন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। আর সে ধারা এখনও বিদ্যমান।

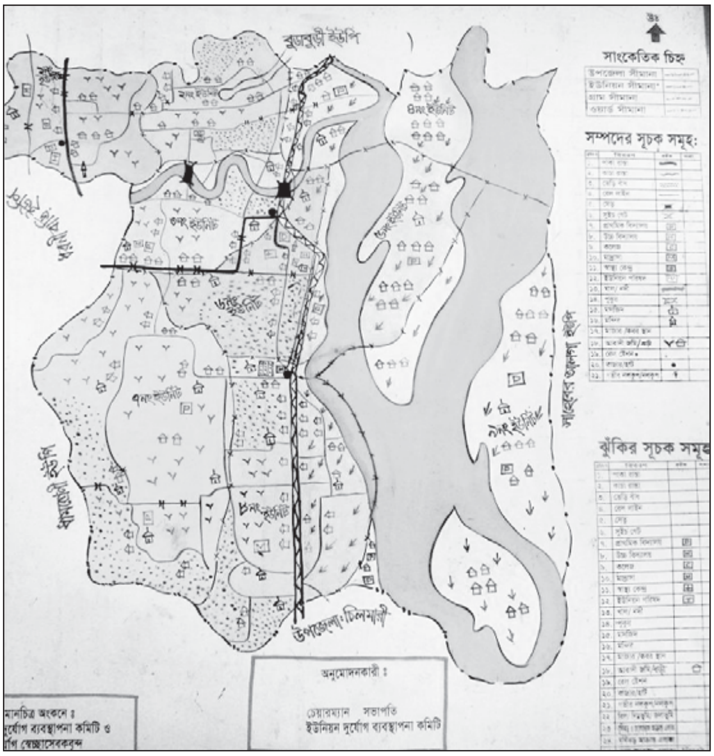

মানচিত্রে বর্তমান হাতিয়া ইউনিয়ন

পারিপার্শ্বিক অবস্থা

হাতিয়া গণহত্যার মূল স্থান দাগারকুটি গ্রাম। গ্রামটির পূর্বে ধরলা নদী এবং পশ্চিমে অনন্তপুর বাজার ও হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয় অবস্থিত ছিল। এ গ্রামের উত্তর দক্ষিণেও কয়েকটি গ্রাম, যা হাতিয়া ও বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মধ্যে ছিল। দাগারকুটি গ্রামের সাথে অন্যান্য গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল মূলত সরু মেঠো পথ। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাওয়া এসব পথ প্রায় প্রতিবছর বন্যা

ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হত। নদী তীরবর্তী হওয়াতে কুড়িগ্রামের অন্যান্য থানায় যাতায়াতের জন্য সহজ মাধ্যম ছিল ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা নদীপথ। এ অঞ্চল থেকে রৌমারী মুক্তাঞ্চলের দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কি.মি।

গণহত্যার পটভূমি

মুক্তিযুদ্ধে কুড়িগ্রামবাসীর ভূমিকা জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল। দেশের ১১টি সেক্টরের মধ্যে ২টি অর্থাৎ ৬নং ও ১১নং সেক্টর এ জেলার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া দু'টি মুক্তাঞ্চলে প্রায় হাজার বর্গমাইল এলাকা শত্রুমুক্ত ছিল নয় মাস ধরে। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে দেশের মাটিতে। সেখানেই করেছে চাঁদমারি। সংগঠিত হয়ে অবস্থান করেছে বাংলার জমিনে, পাকিস্তানি বাহিনীকে ঠেকিয়ে রেখেছে অসীম সাহসী যুদ্ধ করে। মুক্তাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেসামরিক প্রশাসন। সেখানে স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বিচার বিভাগ চালু করে স্বাভাবিক ধারায় বেসামরিক বিচারকার্য সম্পাদন করা হয়। কার্যকর হয় পুলিশ বিভাগ। ডাক বিভাগ, রাজস্ব বিভাগসহ সব কার্যক্রম মুক্তাঞ্চলে চলেছে। এসব প্রত্যক্ষ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অন্য মন্ত্রীবর্গ। এসেছেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীসহ অন্য সমর-নায়করা। এ কারণে কুড়িগ্রামের প্রতি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিশেষ নজর ছিল। এখানকার সাধারণ মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর সামরিক শাসক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে সারা পাকিস্তান ভিত্তিক একটি সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। এর জন্য প্রণয়ন করলেন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন নির্বাচন হবে 'বাঁচার দাবি' ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি রেফারেন্ডাম। তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় বেরোলেন। তাঁর আহ্বানে নৌকার পালে লাগল হাওয়া। তৎকালীন কুড়িগ্রাম মহকুমায় ছিল জাতীয় পরিষদের ৩টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৫টি আসন। সত্তরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগ কুড়িগ্রামের সবকটি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। উলিপুর আসনে মুসলীম লীগের হেবিওয়েট প্রার্থী আবুল কাশেমকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী। এ

এলাকায় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলীম লীগ বাদে জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে, নির্বাচনে তারা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এছাড়া, বাম দলগুলোর মধ্যে ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মুজাফ্ফর) মোটামুটি অবস্থান থাকলেও সত্তরের নির্বাচনে তাঁরা আওয়ামী লীগের পক্ষেই অবস্থান নিয়েছিল। এমনকী নির্বাচন-উত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাম নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে গিয়েছিল। অথচ এদেশের মাটির সাথে চূড়ান্ত নেমকহারামী করে চলছিল মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামীসহ আরও কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। তারা প্রচার চালাচ্ছিল যে, আওয়ামী লীগ ভারতের দালাল, পাকিস্তানের শত্রু। আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভেঙে ভারতের সাথে যোগ দিতে ষড়যন্ত্র করেছে। পূর্ব পাকিস্তানকে তারা হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে চায়। সর্বোপরি, এসব দল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ ও সমমনা অন্যান্য দলকে পাকিস্তানের শত্রু বলে প্রচার চালাচ্ছিল।

কুড়িগ্রামসহ উলিপুরের হাতিয়া ইউনিয়নের জনসাধারণ এসব প্রচারণায় মোটেও কর্ণপাত করেনি। তারা নির্বাচনী ফলাফল অনুযায়ী কেন্দ্রে ও প্রদেশে বাঙালি আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে ছিল উদগ্রীব। কিন্তু, সহজে পশ্চিমারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে– এমন বিশ্বাস তাদের ছিল না। এজন্যই উলিপুরের নির্বাচিত নেতৃত্ব জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে প্রায়ই দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে মিটিং, মিছিল ও জনসভা করত। এরকম কার্যক্রম চলে ১৯৭১-এর জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে। এরই মধ্যে ইয়াহিয়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন হবে বলে ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় উলিপুরের মানুষ আশাবাদী হয়েছিল বটে। কিন্তু, ক্ষমতালিপ্সু পশ্চিমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য আবার পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে ইয়াহিয়ার ১ মার্চের ঘোষণায়। তিনি ঘোষণা দিলেন, ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষের মধ্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্লোগান আসে। সবার মুখ থেকে অগ্নিগোলার মতো বেরোচ্ছিল, 'সংহতিতে লাথি মার–পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর', 'দা-কুড়াল-খন্তা–মুক্তির পন্থা', 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা-মেঘনা-যমুনা', 'তুমি কে আমি কে–বাঙালি বাঙালি', বীর বাঙালি অস্ত্র ধর–পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর', 'পিন্ডি না ঢাকা–ঢাকা, ঢাকা' ইত্যাদি। বিক্ষোভাত্মক মানুষের মিছিলে প্রকম্পিত হতে থাকে উলিপুর থানা সদর ও আশপাশের ইউনিয়নগুলো। হাতিয়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা কানাইলাল সরকারের নেতৃত্বে মিছিল, মিটিং ও বিক্ষোভ সমাবেশ হতে

থাকে। এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রভাগে ছিল স্থানীয় তরুণ, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও সচেতন ব্যবসায়ী সমাজ।

এরপর বঙ্গবন্ধু অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে কুড়িগ্রাম শহর ও থানা সদরগুলোতে যেন অঘোষিত হরতাল শুরু হয়ে যায়। ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণের পর ৯ মার্চ কুড়িগ্রামবাসী এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে। বিশাল জনসমাবেশের পরের দিন ১০ মার্চ কুড়িগ্রাম মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এই সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন যুগ্মভাবে আহমদ হোসেন সরকার ও আহমদ আলী বক্‌শী। কমিটির সদস্য ছিলেন জাতীয় পরিষদ সদস্য রিয়াজউদ্দিন আহমদ (ভোলা মিয়া), মোজাহার হোসেন চৌধুরী ও সাদাকাত হোসেন (ছক্কু মিয়া) এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শামসুল হক চৌধুরী, আবদুল হাকিম, আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হোসেন ও নুরুল হোসেন (পাপ্পু মিয়া)। এছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ প্রগতিশীল দল, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র ইউনিয়ন, আনসার কমান্ডার ইত্যাদি শ্রেণি পেশার মানুষ সংগ্রাম কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৭ মার্চ কুড়িগ্রাম শহরে ছাত্র-গণসমাবেশে প্রথমবারের মত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ছাত্রনেতারা স্বাধীনতার রক্ত শপথ গ্রহণ করেন। মহকুমা সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর কমিটির আহ্বায়ক আহমদ আলী বক্‌শীর ঘোষপাড়াস্থ গোডাউনে কমিটির নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবেই চলছিল প্রস্তুতি।

এলো ২৫ মার্চ। পাকিস্তানি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালির ওপর। চালাল নৃশংস গণহত্যা। এই খবর পৌঁছানোর পর ২৮ মার্চ কুড়িগ্রামের শহর পার্কে আয়োজন করা হয়েছিল বিশাল জনসমাবেশ। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গঠন করা হল চার সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারি হাইকমান্ড। কমিটির চারজন সদস্য হলেন আহমদ আলী বক্‌শী, অধ্যাপক হায়দার আলী, তোসাদ্দুক হোসেন ও মহিউদ্দিন আহমেদ।

কুড়িগ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর আগমন ঠেকানোর জন্য চিন্তা ভাবনা চলতে থাকে। এরই মধ্যে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ কুড়িগ্রামে অবস্থান নেয়। তিনি ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, উলিপুর ও অন্যান্য স্থানে অবস্থানকারী ইপিআর-এর বাঙালি সৈনিকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার নির্দেশ পাঠান। তারা ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নির্দেশ মেনে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং স্ব স্ব কর্মস্থলে অবাঙালি পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে খতম করে দেন। এরই মধ্যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কুড়িগ্রাম শহর দখল করার জন্য রওনা হয়।

সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে তিস্তা ব্রিজের কাছে প্রতিরোধ করার জন্য ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচিত হয়। দু'পক্ষের যুদ্ধ চলে বেশ কিছুদিন। অবশেষে ৭ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ তুলে নিয়ে নিরাপদ অবস্থানে চলে যেতে বাধ্য হন। ঐদিনই পাকিস্তানি বাহিনী দখল করে নেয় কুড়িগ্রাম শহর ও শুরু করে নির্বিচার গণহত্যা। শহর দখল করার কিছুদিনের মধ্যে তারা উলিপুরে ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের সাথে যোগ দেয় মুসলীম লীগ-জামায়াত চক্র। মুসলীম লীগের প্রভাবশালী নেতা আবুল কাশেমের নেতৃত্বে থানা শহর ও ইউনিয়নে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কার্যক্রম। উলিপুর থানা শহরে মাহবুব আলম চৌধুরীর নেতৃত্বে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে গঠিত হয় শান্তি কমিটি। এরই ধারাবাহিকতায় হাতিয়া ইউনিয়নে ডা. বাবর আলীর নেতৃত্বে গঠিত হয় শান্তি কমিটি। এপ্রিল মাসের শেষ দিকেই হাতিয়া ইউনিয়নের অনন্তপুর বাজারে স্থানীয় রাজাকার ও দালালরা একটি মিটিং করে। এ মিটিংয়ে আসার জন্য তারা গ্রামবাসীকে আমন্ত্রণ জানায়। মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডা. বাবর আলীকে শান্তি কমিটির প্রধান করা হয় এবং কমিটির অন্যান্য সদস্য মনোনীত করা হয়।

গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানা সদর থেকে নয় কিলোমিটার পূর্বে হাতিয়া ইউনিয়ন। ব্রহ্মপুত্র নদের উপকণ্ঠে নিভৃত পল্লী দাগারকুটি গ্রাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ৩২ দিন আগে স্থানীয় দালাল ও রাজাকারদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হাতিয়া অপারেশনের নামে নির্মম ও জঘন্যতম বর্বরতা চালিয়ে নির্বিচারে হত্যা করে ইউনিয়নের নিরীহ ও নিরাপরাধ মানুষদের। ভস্মীভূত করে পুরো এলাকা।

হাতিয়ার গ্রামে গ্রামে বিরাট সংখ্যক মুক্তিবাহিনী অবস্থান করছে এবং এদের পিছনে রয়েছে ভারতীয় বাহিনী– এরকম একটি সংবাদ দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এ খবর নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের দালালরা চলে গেল উলিপুরস্থ প্রভুদের ডেরায়। দেরি করলে মুক্তিরা আরো শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রসর হবে উলিপুরের দিকে। আক্রমণ করবে হয়তো কুড়িগ্রাম পর্যন্ত। কারণ, ইতোমধ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা দুর্গাপুরে রেলব্রিজ ধ্বংস করেছে। আক্রমণ করেছে উলিপুর পাকিস্তানি বাহিনীর থানা ক্যাম্প, সম্মুখ যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের নাস্তানাবুদ করেছে বালারহাট ও মণ্ডলারহাটের যুদ্ধে। তাই, অবিলম্বে এদের বিতাড়িত করতে পাকিস্তানি

সেনাবাহিনীর সেখানে অভিযান পরিচালনা করা একান্ত কর্তব্য। আর যায় কোথা? শুরু হয়ে গেল প্রস্তুতি। শত শত পাকিস্তানি সেনাকে প্রস্তুত করা হলো হাতিয়া অপারেশনের জন্য। তার ওপর রাজাকার বাহিনী। উলিপুর থানার রাজাকারদের ডেকে নেয়া হয়। সন্নিহিত চিলমারী এবং অন্যান্য অবস্থান থেকেও ডাক পড়ে এ কুখ্যাত বাহিনীর। জামায়াতিদের সংগঠন আল বদর, আল শামস্ শুধু নয়– জামায়াত নেতারাও নাকি বন্দুক হাতে সেখানে গিয়েছিল পাকিস্তানিদের সাথে। সমগ্র এলাকার সব গরুর গাড়ি নিয়ে আসা হয় ধরে ধরে। আর শেষ রাতে রওনা করে

দাগারকুটি গ্রামের এই স্থানেই গণহত্যা চলে
ছবি : সুশান্ত ভৌমিক

শত শত গরুর গাড়ি। তাতে ছিল গোলাবারুদ, রসদপত্র ইত্যাদি। কত শত সৈন্য আর রাজাকার-আল বদর সেদিনের অপারেশনে অংশ নিয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তবে ভোর হওয়ার আগেই পুরো হাতিয়া ইউনিয়ন ঘেরাও করে ফেলে হানাদার বাহিনী। হাতিয়ার একদিকে ধরলা নদী। অন্য তিনদিক থেকে ঘেরাও করে পাকিস্তানি সেনা।

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর। ওইদিন ছিলো ২৭ রমজান। দিনটি ছিলো শনিবার। সেহেরি খেয়ে দোয়া-দরুদ পড়ছে রোজাদাররা। মসজিদে আজানের ধ্বনি। কোথাও শুরু হয়েছে নামাজ। কেউ কেউ নামাজ পড়ে ছুটছেন মাঠের দিকে। অনেকে ক্ষেতের কাজে-কেউবা মাছ ধরতে। এ সময় সমস্ত নীরবতা ভেঙে শোনা যায় গগনবিদারী আওয়াজ। চমকে উঠে গ্রামের নিরীহ-নিরস্ত্র লোকজন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। দ্রাম দ্রাম করে বিকট শব্দ আসতে লাগল চারদিক থেকে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো লোকজন। ঘরের অর্গল খুলতেই চোখ ছানাবড়া। আগুনের ফুলকি আকাশছোঁয়া। প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের লেলিহান শিখা। এদিক-ওদিক পুড়ছে, দগ্ধ হচ্ছে। ছাইভস্মে পরিণত হচ্ছে বাড়িঘর, গরু-ছাগল, আর মানুষজন। ঘর থেকে যে বেরুতে পারেনি সে তো পুড়ে মরছে ভেতরেই। বিশেষ করে শিশু-বৃদ্ধ এবং মহিলারা। বেরুতে যারা সমর্থ হয় তারাই পড়ছে আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে। বুকে বিদ্ধ হচ্ছে পেন্টাগন ও বেইজিং-এর বুলেট। প্রায় দশ ঘণ্টাব্যাপী হত্যাযজ্ঞ চালায় নরপশুরা। এ কাজে সহায়তা দিয়ে যেতে থাকে মুসলীম লীগ, জামায়াতে ইসলামী। ইসলামের পবিত্র বুলি ব্যবহার করে শত শত লোককে হত্যা করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে তারা। পাকিস্তানি সেনাদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে এসেছে। নিজেরাও অস্ত্র হাতে গণহত্যায় শরিক হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব আধা-সামরিক বাহিনী আল বদর-রাজাকাররা তো ছিলই।

হাতিয়া ইউনিয়নের প্রায় প্রতি গ্রামে সেদিন নারীর শ্লীলতাহানি ঘটিয়েছে পাষণ্ডরা। আর কোন্ বাড়িতে যুবতী মেয়ে রয়েছে, কার বউ সুন্দরী সে বাড়িগুলোতে তালিকা অনুযায়ী পাকিস্তানিদের নিয়ে যায় জামায়াতিরা। নারীদেহ ভোগ করেছে পাকিস্তানি সেনা, রাজাকার, আল বদর, জামায়াত ও মুসলীম লীগ নেতারা মিলে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা পৌঁছল অনন্তপুর বাজারে। হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই বাজার। শোভা পাচ্ছিল ক'মাস আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পোস্টার-ব্যানার। আওয়ামী লীগের ব্যানার দেখা মাত্রই তাতে গুলি ছুঁড়তে থাকে তারা। অনবরত ঝরায় বারুদ। তারপর বাবর আলীর বাড়ি। যার বাড়িতে জিয়াউর রহমান আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং যিনি তাকে

দিয়েছিলেন সাড়ে ৭শ’ টাকা। সে বাড়িতেও ছিল আওয়ামী লীগের পোস্টার সাটানো। তাই গুলিতে বাড়িটি ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। লোকজনকে হত্যা করে। তবে পোস্টারের ওপর রাগ মেটানোর ফাঁকেই সটকে পড়েন বাবর আলী। পালানোর সময় সাথে ছিল নগদ টাকা ও স্বর্ণ। যা এক পাকিস্তানি সেনাকে ঘুষ দিয়ে নিজের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণ দিয়েছেন তারই ভাই জোবেদ আলী ও আবদুল ওহাব। যারা পাকিস্তানিদের দৃষ্টি এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন তারা ছুটে যান ধরলা নদীর দিকে। সেখানে নদীর ঢালুর আড়ালে সবাই বসে থাকেন গাদাগাদি করে।

এভাবেই হাতিয়া ইউনিয়নের বাগুয়া, অনন্তপুর, রামখানা, নয়াডোরা, নীলকণ্ঠ ও দাগারকুটিসহ পাশাপাশি গ্রামগুলো থেকে অসংখ্যা নিরাপরাধ মানুষকে দাগারকুটি এনে গুলি চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেদিন শুধু হাতিয়া নয়, পার্শ্ববর্তী বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের কলাকাটা, জলংগারকুটি, ফকির মোহাম্মদসহ কয়েকটি গ্রামে হামলা করা হয়েছিলো।

দীর্ঘ অপারেশন পরে ধৃত বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় হাজারের মতো। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সবাইকে নিয়ে যায় অনন্তপুর বাজারের পূর্ব দিকে একেবারে দাগারকুটি গ্রামে। এরপরেই ধরলা নদী। তীরবর্তী একটি ডোবামতো স্থানকেই নির্বাচন করে বধ্যভূমি হিসেবে। শত শত বাঙালিকে দাঁড় করায় সুশৃঙ্খল সারিতে। বারবার পরখ করছিল হায়েনা প্রধান। যেন সূচাগ্র পরিমাণও বাঁকা না থাকে কোথাও। গ্রামের অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত নিরীহ মানুষজন তখনও বুঝতে পারেননি কী ঘটছে বা কী ঘটতে যাচ্ছে। শুধুই হুকুম তামিল করে চলছে তারা। কেটে গেল কিছুক্ষণ। নিখুঁত সোজা হলো মানুষের সারি। গর্জে উঠল দানবগুলোর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। দ্রাম-দ্রাম, গুড়ুম গুড়ুম, টেরেং টেরেং। এই কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর সবই নীরব-নিথর। ফিনকি দিয়ে ছুটলো শোণিত ধারা। প্রায় শুকনো ডোবাটি রক্তে টইটম্বুর হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এক সময় সে স্রোতও মিশে একাকার হলো ধরলার অগাধ জলে। অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে হায়েনাগুলো। কোলাকুলি করে রাজাকার আর পাকিস্তানি হায়েনার দল। ঢুকে পড়ে আশপাশের ঝোপঝাড়ে, দূর-দূরান্তের গ্রামে গ্রামে। যেখানে নিজেকে রক্ষার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে মা-বোনেরা। ঝাঁপিয়ে পড়ে পশুগুলো তাদের ওপর। চরিতার্থ করে তারা হীন লালসা। সেখানেও ভাগাভাগি করেছে পাকিস্তানি মিলিটারি, মুসলীম লীগ এবং রাজাকাররা। দাগারকুটি থেকে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে এক সময় চলে যায় পাকিস্তানি সেনারা। তারও বেশ পরে আশপাশের কিছু কিছু লোক বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন বধ্যভূমির দিকে। খুঁজতে থাকেন প্রিয়জনের মুখ। দাগারকুটিতে

তখন লাশের পাহাড়। শবদেহের ওপর শবদেহ। এ যে কতো হৃদয়বিদারক তা জানেন শুধু প্রত্যক্ষদর্শীরা। অনেকের লাশ সেদিন তুলে নিয়ে দাফন করেছেন প্রিয়জনরা। কিছু কিছু তো ভেসে গেছে ধরলার জলে। আর অধিকাংশ মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল ডোবার ভেতর। কিছু কিছু লোক গুলিবিদ্ধ হয়েও মরার ভান করে পড়ে থাকেন লাশে স্তূপে। পরে উদ্ধার করা হয়েছিল এদের। চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলাও হয়েছিল অনেককে। এদের মধ্যে আজ বেঁচে আছেন বাবর আলী, শাহের আলী, কামাল উদ্দিন, সুলতান আলীসহ মাত্র কয়েকজন।

নদীভাঙনের পর হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয়ের পাশে নির্মিত স্মৃতিসৌধ

কতোজন তাৎক্ষণিক প্রাণ দিয়েছিলেন সেদিন? উলিপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মিজানুর রহমান সংগৃহীত তালিকার উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, সেদিন সেখানে প্রাণ দিয়েছেন ৬৯৭ জন গ্রামবাসী। হাতিয়া পল্লী উন্নয়ন যুব সমিতির সভাপতি শিক্ষক মতিয়ার রহমানও সায় দেন তাতে।

গণহত্যা-নির্যাতনকারীর পরিচয়

হাতিয়া গণহত্যার মূল ঘাতক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। বিরাট সংখ্যক পাকিস্তানি সেনা সেদিন হাতিয়ার সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ চালায়। আক্রমণকারী পাকিস্তানি সৈন্যদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে পাকিস্তানি বাহিনীকে গণহত্যা চালাতে যেসব রাজাকার-দালাল খুব সক্রিয় ছিল তাদের কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাদের তুলে ধরা হল :

ডা. বাবর আলী

ডা. বাবর আলীর বাড়ি হাতিয়া ইউনিয়নের হিজলি গ্রামে। ১৯৭১ সালে তিনি পরিচিত ছিলেন বাবর ডাক্তার নামে। পিতার নাম বুদ্ধি ব্যাপারী। ১৯৭১-এ তিনি ছিলেন উলিপুরের আফাজ ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। সে সূত্রে উলিপুর শান্তি কমিটির প্রধান মাহবুব আলম চৌধুরীর সাথে তাঁর ছিল দহরম মহরম। সেই সূত্র ধরেই পাকিস্তানি বাহিনীর উলিপুর থানা ক্যাম্পের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ঐসময় তিনি মুসলীম লীগ করতেন বলে জানা যায়।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে হাতিয়া ইউনিয়নে যে শান্তি কমিটি গঠিত হয় ডা. বাবর তার অন্যতম কারিগর। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতিয়া অপারেশনেরও (১৩ নভেম্বর) অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তিনিই কয়েকজন সহচরসহ পাকিস্তানি সেনাদের পথ চিনিয়ে হাতিয়ায় নিয়ে আসেন। ঐদিন হাতিয়ার বিভিন্ন গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা যে নারকীয় কর্মকাণ্ড চালায় তার সহযোগী ডা. বাবর আলী।

স্বাধীনতার পর তিনি বেশ কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। '৭৫-এর পট পরিবর্তনের সুযোগে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন এবং হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হন। তাঁর পরিবার বর্তমানে জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত।

মাওলানা আকবর আলী

হাতিয়া ভবেশ গ্রামের টুংকু তাহেরের ছেলে মাওলানা আকবর আলী ১৯৭১ সালে ছিলেন মাদ্রাসার ছাত্র। ইউনিয়ন শান্তি কমিটির অন্যতম সদস্য আকবর মাওলানা একাত্তরে ঘৃণ্য চরিত্রে অবতীর্ণ হন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতিয়া অপারেশনের পেছনের কুশীলবদের তিনি একজন। হাতিয়ায় ঝরা রক্তের জন্য, বিশেষ করে তাঁর নিজ গ্রামে সংঘটিত গণহত্যার জন্য এলাকাবাসী তাঁকে দায়ী করেন।

দেশ স্বাধীন হলে তিনি বালারচর নাসিরীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন এবং জামায়াতের রাজনীতিতে জড়িত হন। বর্তমানে তাঁর সন্তানেরা এলাকায় বেশ প্রভাবশালী।

আব্দুল মজিদ

আব্দুল মজিদ ১৯৭১-এ ছিলেন ছাত্র। হাতিয়ার রামখানা গ্রামের কুদরুতুল্ল্যা মুন্সির ছেলে আব্দুল মজিদ হাতিয়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মজিদ রাজাকার হিসেবে সমধিক পরিচিত এই ব্যক্তি হাতিয়া গণহত্যাযজ্ঞে পাকিস্তানি বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। নিজ গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাপন্থী পরিবারগুলোকে পাকিস্তানি সেনাদের 'বন্দুকের খাবার' বানাতে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

যুদ্ধ শেষে তিনি বাগুয়া অনন্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। আজীবন জামায়াতি এই ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ বর্তমানে জামায়াতের সাথে জড়িত।

সাইদুর মাওলানা (৭০)

সাইদুর মাওলানা হাতিয়া ভবেশ গ্রামের অধিবাসী। মুক্তিযুদ্ধে তিনি এই এলাকার অন্যতম প্রধান রাজাকার ছিলেন। মাদ্রাসা হতে লেখাপড়া করা মাওলানা সাইদ তৎকালে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ছিলেন। তিনি হাতিয়া গণহত্যা সংঘটনে পাকিস্তানি সেনাদের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী।

তিনি নিজ বাড়িতে স্থাপিত মাদ্রাসা ও এতিমখানার অধ্যক্ষ পদে আসীন। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ, তিনি এখনও দেশবিরোধী কথাবার্তা বলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর সন্তানেরাও এ কাজে লিপ্ত। জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে জড়িত এই পরিবার এলাকায় বেশ প্রভাবশালী।

১৯৭১ সালে হাতিয়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটির তালিকা :

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১.	ডা. বাবর আলী	বুদ্ধি ব্যাপারী	হিজলী	হাতিয়া
২.	মোঃ আকবর আলী মাওলানা	তাহের (টুংকু)	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৩.	রিয়াদ উদ্দিন সরকার	আব্দুল গফুর	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৪.	মোঃ জহির উদ্দিন	পোনদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৫.	আব্দুল মজিদ	কুদরুতুল্ল্যা মুন্সি	রামখানা	হাতিয়া
৬.	অছিমুদ্দিন ব্যাপারী	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭.	ডা. সাবদুল হোসেন	জহর দেওয়ানী	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৮.	উমর আলী সুপি	অহর উদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৯.	আজরুদ্দিন ব্যাপারী	রাঙা মামুদ	রামখানা	হাতিয়া
১০.	ডা. হাফেজ উদ্দিন	নেছাব উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
১১.	কুদরুতুল্ল্যা মুন্সি	মিরুল্ল্যা সেখ	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
১২.	কাচু ব্যাপারী	নজীর মামুদ	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
১৩.	মিছির উদ্দিন		আইর কুঠির গ্রাম	হাতিয়া
১৪.	ওছমান আলী ব্যাপারী	আতাউল্ল্যা ব্যাপারী	নীল কণ্ঠ	হাতিয়া
১৫.	এজাবুদ্দিন মুন্সি	বকসী তেলী	তাঁতী পাড়া	হাতিয়া
১৬.	বকিয়তুল্ল্যা মুন্সি	মহিমুদ্দিন	দিগল হাল্ল্যা হিজলী	হাতিয়া
১৭.	আরিফ উদ্দিন		নতুন অনন্তপুর	হাতিয়া
১৮.	মোঃ জহির উদ্দিন মাস্টার	টোনিয়া সেখ	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
১৯.	বকিয়ত তহশিলদার	হাজী মহিমুদ্দিন	হিজলী	হাতিয়া
২০.	মোঃ ছাবেদ আলী মণ্ডল	জাহর উদ্দিন মণ্ডল	হিজলী গোপপাড়া	হাতিয়া
২১.	অছিম উদ্দিন মাস্টার	ফকর উদ্দিন শোনার	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
২২.	ফুকতুল মুন্সি		হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
২৩.	পাগলা মুন্সি	আতিবুল্ল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪.	মোঃ আহম্মেদ আলী	নসিবুল্ল্যা	রামরামপুর	হাতিয়া
২৫.	মোঃ আঃ ছামাদ	আলেপুদ্দিন	শ্যামপুর	হাতিয়া

(অসম্পূর্ণ)

হাতিয়া গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী রাজাকারদের তালিকা :

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১.	মোঃ আব্দুল জব্বার মুন্সি	আশমত আলী	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
২.	মোঃ শওকত আলী	ছমল মিস্ত্রি	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৩.	মোঃ আব্দুর ছামাদ দপ্তরী	জলিল	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৪.	মোঃ ইছব আলী	কমর উদ্দিন ব্যাপারী	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৫.	মোঃ হাতেম আলী	অতি উল্ল্যা	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৬.	মোঃ আঃ ছালাম	মোঃ আব্দুল জব্বার	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৭.	মোঃ আহাম্মদ আলী	বদিয়তুল্ল্যা	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৮.	মোঃ মোনতাজ আলী	খেজাব উদ্দিন তেলি	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৯.	মোঃ ওছমান আলী	পোনদ্দিন মন্ডল	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১০.	মোঃ ফজল উদ্দিন	খর শেখ	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১১.	মোঃ ওয়াহেদ আলী	আঃ গফুর	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১২.	মোঃ আঃ জলিল মওলানা	নছর শেখ	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১৩.	মোঃ নছির শেখ	কচ্ছুত	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১৪.	সজর উদ্দিন	বাজারী শেখ	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১৫.	মোঃ শাহাবুদ্দিন	সজর উদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১৬.	মোঃ আবুল কাশেম মুন্সি	এচান তেলি	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
১৭.	মোঃ অঞ্জন আলী	কাচু ব্যাপারী	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
১৮.	মোঃ কোব্বাছ আলী	কমর উদ্দিন	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
১৯.	মোঃ আঃ জব্বার	মিয়াজুদ্দিন	হাতিয়া গ্রাম	হাতিয়া
২০.	মান্তা শেখ	ওছমান ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২১.	বকিয়ত	হেকরা ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২২.	মোঃ আঃ ছামাদ	হেকরা ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২৩.	ছোলেমান	করিম বক্স	রামখানা	হাতিয়া

ক্রম	নাম	পিতার নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৪.	মোঃ আকবর আলী	আজরুদ্দিন ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২৫.	মোঃ শহিদুর মওলানা	তমিজ উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৬.	মিয়াজন		রামখানা	হাতিয়া
২৭.	মোঃ শাহজাহান	আমিন উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৮.	মোঃ শমসের আলী	নেছাব উদ্দিন	নীলকণ্ঠ	হাতিয়া
২৯.	মোঃ আকবর আলী	চাঁদিয়া বাছের	রামখানা	হাতিয়া
৩০.	খেরু শেখ	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩১.	মোঃ আবু বক্কর সরকার	কাশেম আলী সরকার	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২.	মোঃ জবিয়ল হক	আজিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩.	মোঃ জাহের আলী	নজবুদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৩৪.	মোঃ মাজুর উদ্দিন	নেছাব উদ্দিন	সোনার পাড়	হাতিয়া
৩৫.	কাশেম মুন্সি		অনন্তপুর সোনার পাড়	হাতিয়া
৩৬.	মোঃ ময়েজ উদ্দিন মুন্সি	মেহার শেখ	অনন্তপুর গাবুরজন	হাতিয়া
৩৭.	মোঃ আব্দুল্ল্যা মুন্সি	হায়পত সোনার	হিজলী গোপপাড়া	হাতিয়া
৩৮.	মওলানা হাদিউর জামান	ফুকতুল মুন্সি	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৩৯.	ফজল উদ্দিন	তনে মামুদ	হিজলী গোপপাড়া	হাতিয়া
৪০.	মোঃ ছামাদ আলী	বকিয়তুল্যা মুন্সি	হিজলী	হাতিয়া
৪১.	একা মুন্সি	মহিমুদ্দিন	হিজলী	হাতিয়া
৪২.	মোঃ আবেদ আলী	জহির উদ্দিন মণ্ডল	হিজলী গোপপাড়া	হাতিয়া
৪৩.	মোঃ শমসের আলী	বসারতুল্যা ব্যাপারী	গোয়াল পাড়া	হাতিয়া
৪৪.	মোঃ আঃ খালেক (দুলাল)	কাশেম আলী	চিড়া খাওয়ার পাড়	হাতিয়া

(অসম্পূর্ণ)

শহীদদের তালিকা ও পরিচয়

মুক্তিযুদ্ধের সময় হাতিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল শক্ত অবস্থান। মুক্তিযোদ্ধারা এ ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি ক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পগুলো ছিল কদমতলার বছির উদ্দিনের বাড়ি, চৌমুহনীর বাবর আলীর বাড়ি বা বাউরার বাড়ি, হিজলি-গোপপাড়ার সুধীর মাস্টারের বাড়ি ও একটু দূরে বুড়াবুড়ির দলন গ্রামে। মূলত এসব ক্যাম্পে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনী এই এলাকায় অপারেশন চালিয়েছিল। তারা তিনদিক থেকে (ধরণীবাড়ি টু হাতিয়া, উলিপুর টু হাতিয়া ও চিলমারী টু হাতিয়া) আক্রমণ করেও মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে ব্যর্থ হয়। এরপর তারা বাঙালি নিধনযজ্ঞে নেমে পড়ে। এই নির্বিচার গণহত্যায় যারা শহীদ, তাদের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল :

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১.	কাচুয়া সেখ	নেদা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২.	নছিয়ত উল্যা	মানু উল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩.	আনছার উদ্দিন	আছর উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪.	আবদাল	মেছের উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫.	চিনিরুদ্দিন	মেছের উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৬.	আমজাদ	আমিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭.	ছপর উদ্দিন	আমিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৮.	আজিমুদ্দীন	হারাধন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৯.	বাবুর উদ্দীন	আফান সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
১০.	কেরু মামুদ	আফান সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
১১.	আজি সেখ	ভাংটু	অনন্তপুর	হাতিয়া
১২.	বাবর আলী	মতি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৩.	ধনিয়া	টোরা	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৪.	পচু সেখ	সুমাদ্দি	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৫.	জলিল	হাবিবতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৬.	জব্বার	হাবিবতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৭.	ইউসুফ	এছান	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৮.	সমসের আলী	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
১৯.	ইব্রাহীম	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০.	শান্ত রবিদাস	ভবেশ রবিদাস	বক্সীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
২১.	আবু বক্কর	শরিয়ত উল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২.	রহিম উদ্দিন	ইমির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩.	অচির উদ্দিন	নেছাব উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪.	ফয়েজ উদ্দিন	নছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫.	নেলচ মামুদ	তকের মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৬.	মজাহার আলী	এছান উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭.	কফিল উদ্দীন	আনুর তেলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮.	হাফেজ	চেচারু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৯.	বাবর উদ্দীন	ছেপের উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩০.	মজিবর	এছাম তেলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩১.	মহুবর রহমান	এছাম তেলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২.	জমিলা খাতুন	বাবর উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩.	কাচুয়া সেখ	ছেপের উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪.	ফয়জন বিবি	ফয়েজ উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫.	আব্দুর রহমান	আলেপ উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৬.	ছাহাবুদ্দিন	ইছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৭.	কাচুয়া সেখ	বছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৮.	এলাহী বক্স	সৈমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৯.	গাছুল সেখ	টুসকু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪০.	কপুর উদ্দিন	বৈরাগী সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪১.	যতিব আলী	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪২.	খয়বার আলী	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৩.	আহাম্মদ আলী	উমালু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৪.	খচিয়ত উল্যা	জহির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৫.	গ্যানছার আলী	সজ মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৬.	আকবর আলী	আকদ্দি সরকার	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৭.	উজির আলী	শালকা চৌকিদার	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৪৮.	আজিমুদ্দিন	এছান সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৯.	আলিমুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫০.	আফাজুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫১.	আমিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
৫২.	শহর মৌলভী		অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৩.	ছোট কাচুয়া	নেস মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৪.	নেস মামুদ	হারাধন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৫.	আমজাদ আলী	আজুদ্দি	সাতভিটা	হাতিয়া
৫৬.	হায়দার আলী	ওসমান আলী	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৫৭.	হোসেন আলী	ছমির উদ্দিন	সাতভিটা	হাতিয়া
৫৮.	আব্দুর রহমান	জমির উদ্দিন	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৫৯.	আজর উদ্দিন	ভেলু মামুদ	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৬০.	শমসের আলী	আঃ মালেক	জলঙ্গারকুটি	বুড়াবুড়ি
৬১.	একাব্বর আলী	বাবর আলী	জলঙ্গারকুটি	বুড়াবুড়ি
৬২.	বাহাদ্দি সেখ	খয়বর আলী	বৈরাগীর হাট	হাতিয়া
৬৩.	সোচা সেখ	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৪.	বাবর উদ্দিন	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৫.	বোচা সেখ	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৬.	আব্দুল জলিল	বোচা সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৭.	হামেদ আলী	গেদলা সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৮.	বেনছার আলী	যোদ সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৯.	আনছার আলী	যোদ সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭০.	মেজার উদ্দিন	আছদ্দি সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭১.	পাগলা	জোনাবদ্দিন	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭২.	আব্দুল জাব্বার	অহর উদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৭৩.	মামুদ আলী	অকর উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
৭৪.	কেছাব উদ্দিন	হামু সেখ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
৭৫.	নেছাব উদ্দিন	কেতাব উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭৬.	হারান সেখ	করিমুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭৭.	হায়দার আলী	ফরমান আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৭৮.	আঃ আজিজ	মোহাম্মদ আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৭৯.	আঃ জব্বার	হামিদ আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৮০.	মোজাম্মেল হক	আঃ রহিম	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৮১.	উমর আলী	জয়নাল সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮২.	বাবর আলী	জয়নাল সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৩.	মোহাম্মদ আলী	হাসেম আলী	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৪.	উমেল সেখ	হজ্জদি সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৫.	মতিয়ার রহমান	নজ্জদি সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৬.	বাহার আলী	খয়বর আলী	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৭.	জব্বার আলী	জহদ্দি সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৮.	আজাহার আলী	মনিয়া সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৯.	মতিউর রহমান	মানিক সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯০.	দুকু সেখ	আমুদ্দি সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯১.	জয়নুদ্দিন	ছব্বার আলী	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯২.	মংলা সেখ	আজিমুদ্দিন	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯৩.	নওসাদ আলী	আকালু সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৪.	মমেনা খাতুন	উজির আলী	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৫.	বিসাময়ী দাস	জোমা দাস	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৬.	শামুক বর্মন	মাধাই বর্মন	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৭.	সলেয়া সেখ	জনাদ্দি সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৮.	মানিক মিয়া	অমূল্য সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৯.	হোসেন আলী	মনাদ্দি সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
১০০.	মমর উদ্দিন	জয়নাল সেখ	মধ্যগ্রাম	হাতিয়া
১০১.	জমির উদ্দিন	সৈমুদ্দিন সেখ	মধ্যগ্রাম	হাতিয়া
১০২.	এমরান আলী	জয়নাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৩.	মনদ্দি	আজিমুদ্দিন	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৪.	আজুদ্দিন	নছের মামুদ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৫.	নলকু মিয়া	আঃ মালেক	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৬.	হযরত আলী	বেলাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৭.	নাজিমুদ্দিন	জামাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৮.	আম্মার আলী	খয়বার আলী	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৯.	মোস্তফা	রহিমুদ্দিন	বকসীপাড়া	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১১০.	মিজানুর	ছমতুল্যা	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১১.	লোকমান	নাজিমুদ্দিন	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১২.	মনির	লোকমান আলী	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৩.	আমিনুল	কাবু মামুদ	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৪.	সমশের	কলিমুদ্দিন	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৫.	আতাউর	বছিয়তুল্যা	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৬.	মনিরা সেখ	আবুল কাশিম	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৭.	লাল বাবু	কছের মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৮.	নাছিম উদ্দিন	আঃ ছাত্তার	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৯.	আপাস সেখ	কালু সেখ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২০.	আঃ রশিদ	আঃ করিম	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২১.	ইকবাল	খচর মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২২.	তমিজ উদ্দিন	সোনা উল্যা	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৩.	গোপাল উদ্দিন	নাজিম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৪.	হবিবর	মাম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৫.	একাব্বর আলী	ছমতুল্যা	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৬.	মোবারক আলী	ওসমান আলী	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৭.	আলিম উল্যা	তকের মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৮.	কাসেম আলী	কছিম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৯.	বাবর উদ্দিন	নাছির মামুদ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩০.	আব্দুর রহমান	আঃ মজিদ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩১.	আলাল হক	গোলজার	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩২.	মফিজ উদ্দিন	দছিম উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৩.	আঃ করিম	আঃ আজিজ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৪.	ওনাবদ্দি	মজির উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৫.	তকের মামুদ	আলা বক্স	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৬.	নাজমুল	হায়দার আলী	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৭.	জহির উদ্দিন	জয়নাল উদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৩৮.	গোলাপ উদ্দিন	জয়নাল উদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৩৯.	নায়েব আলী	আলাল হক	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪০.	ছকমল হোসেন	আজুদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৪১.	আঃ রশিদ	আঃ রহমান	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪২.	নজর আলী	ওসমান আলী	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪৩.	হযরত আলী	খয়বার আলী	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৪.	এমরান আলী	হাজারী মামুদ	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৫.	এরশাদুল হক	জমির উদ্দিন	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৬.	জালাল উদ্দিন	মোবারক আলী	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৭.	আঃ করিম	আঃ রহমান	সাতভিটা	হাতিয়া
১৪৮.	সোলেমান আলী	লোকমান আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৪৯.	এমদাদুল হক	ফরিদুল হক	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫০.	জাহিদুল	ফরমান আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫১.	ওয়ালীউর	কাসেম আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫২.	মাহতাব আলী	আঃ মজিদ	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫৩.	এজাজল হক	ফলে মামুদ-২	মিতাইকার	হাতিয়া
১৫৪.	রহিজ উদ্দিন	ফলে মামুদ-২	মিতাইকার	হাতিয়া
১৫৫.	রিয়াজুল হক	কছদ্দি সেখ	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৬.	ফরমান আলী	হোসেন আলী	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৭.	সিদ্দিকুর রহমান	তমিজউদ্দিন	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৮.	বাছের আলী	জামাল উদ্দিন	ভরতবলী	হাতিয়া
১৫৯.	হাবিবুল্যা	জামাল উদ্দিন	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬০.	সেকেন্দার আলী	মজিবর রহমান	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬১.	তছের আলী	ফারাজ উদ্দিন	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬২.	আলাবক্স	জয়নাল	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬৩.	হারুন মিয়া	ফয়জার আলী	চাঁদপুর	হাতিয়া
১৬৪.	এলাহী বক্স	ফয়জার আলী	চাঁদপুর	হাতিয়া
১৬৫.	দেওয়ান আলী	তরিকুল হক	বালাবাড়ী	হাতিয়া
১৬৬.	ইসমাইল হোসেন	তোজাম্মেল	বদরগঞ্জ	হাতিয়া
১৬৭.	জহুরুল হক	ফরমান আলী	বদরগঞ্জ	হাতিয়া
১৬৮.	রফিকুল ইসলাম	জমির উদ্দিন	কাজীগ্রাম	হাতিয়া
১৬৯.	ফজলু সেখ	একাব্বর আলী	কাজীগ্রাম	হাতিয়া
১৭০.	আজিজল হক	বছির উদ্দিন	বোতলা	হাতিয়া
১৭১.	নজরুল ইসলাম	হজরত আলী	বেলকুচি	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৭২.	হেলাল মিয়া	কাসেম আলী	বেলকুচি	হাতিয়া
১৭৩.	দেলবর হোসেন	ছটকু মামুদ	বেলকুচি	হাতিয়া
১৭৪.	তোফায়েল হক	কেচু মামুদ	কাশিপুর	হাতিয়া
১৭৫.	মতিন মিয়া	ছেপাতুল্যা	কাশিপুর	হাতিয়া
১৭৬.	চান্দ মিয়া	জহদ্দি সেখ	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৭.	মতিউল্যা	কলম উদ্দিন	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৮.	উমর আলী	কাশেম আলী	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৯.	এশার আলী	জহদ্দি সেখ	টোংগার	হাতিয়া
১৮০.	ভেলকা সেখ	আজিমুদ্দিন	টোংগার	হাতিয়া
১৮১.	আসাদুল হক	শহর উদ্দিন	টোংগার	হাতিয়া
১৮২.	ময়েন উদ্দিন	বারু সেখ	টোংগার	হাতিয়া
১৮৩.	মজির উদ্দিন	নেকাত উল্যা	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৪.	আঃ জলিল	মেজার আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৫.	হারুন মিয়া	রহিমুদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৬.	কেথাত উল্যা সেখ	হায়দার আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৭.	আঃ গফুর	বছির উদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৮.	মাদারী সেখ	হাজারী মামুদ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৯.	বেলাল হোসেন	কদিমল হক	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯০.	সুকালু মামুদ	তকের মামুদ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯১.	কাল মামুদ	ইছির উদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯২.	সোনা উদ্দিন	সেতর সেখ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯৩.	লুৎফর রহমান	তকের আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯৪.	নিয়ামত আলী	বছির মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৫.	অছিয়ত উল্যা	ফেতরু সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৬.	জোনাবদ্দি	ফেতরু সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৭.	বাছদ্দিন সেখ	জেলাল উদ্দিন	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৮.	মনিরা সেখ	ধন মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৯.	শরিতুল্যা	ফুল মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
২০০.	উজির আলী	সোনা সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
২০১.	নবাব আলী	আঃ জলির	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০২.	ব্যাংগু সেখ	তছদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২০৩.	ইসলাম	বাছতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৪.	ওয়াহেদ আলী	বাছতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৫.	সেরু সেখ	হামেদ আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৬.	আমুদ্দিন সেখ	তছদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৭.	লাল মিয়া	হারুন মিয়া	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৮.	ওহাব আলী	আঃ বারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৯.	শহর উদ্দিন	ভোলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১০.	শহর মামুদ	আঃ জব্বার	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১১.	ভেলকু সেখ	নাছির মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১২.	জেলাবদ্দি	আলাদ্দি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৩.	আশারু সেখ	বেতারু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৪.	আঃ বাকী	আঃ হাদি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৫.	ফয়জার	জয়নাল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৬.	মনিম	জহদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৭.	মামুন	রহিম উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৮.	খাইরুল	আঃ জব্বার	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৯.	মানিক	ধনিয়া সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২০.	তরিক উদ্দিন	যতির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২১.	বরকত	জেলাদ্দি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২২.	তছরু	আজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২৩.	আশরাফুল	আঃ গনি	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৪.	কেতরু	আজিজল	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৫.	হেলাল	আজিজল	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৬.	মতিউল্যা	জোনাবদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৭.	নাজির	জোনাবদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৮.	হেসফারী	জামাল উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৯.	হেদল	জামাল উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩০.	নাছিরুদ্দিন	অহদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩১.	রেজাউল	বদিউজ্জামান	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩২.	মজুর উদ্দিন	আব্দুল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৩.	শহর উদ্দিন	আব্দুল	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৩৪.	মেছের উদ্দিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৫.	সবারত		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৬.	ময়েন উদ্দিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৭.	আঃ আজিজ	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৮.	আঃ লতিফ	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৯.	আঃ গফফার	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪০.	আঃ জব্বার	ওসমান আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪১.	মেহের বিবি	ছমত সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪২.	গোলজার	শহর মিস্ত্রি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৩.	আলী সেখ	করমত উল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৪.	মজিবর	আলেফ উদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
২৪৫.	ফকদ্দিন	মালগন্ডি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৬.	ঝড়ু সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৭.	শরু সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৮.	খাদিম মামুদ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৯.	আমিন উদ্দিন	জেনাতুল্যা	নীলকাটি	হাতিয়া
২৫০.	নাজিম উদ্দিন	ফজর চাটু	নীলকাটি	হাতিয়া
২৫১.	সুটকু	মেহের পাগলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫২.	নজির হোসেন	আলে মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৩.	ছাত্তার আলী		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৪.	দুরলভ		নীলকাটি	হাতিয়া
২৫৫.	নেছাব উদ্দিন		নীলকাটি	হাতিয়া
২৫৬.	খতব উদ্দিন		রামখানা	হাতিয়া
২৫৭.	কছিম উদ্দিন	জেনাতুল্যা	গুজিমারী	হাতিয়া
২৫৮.	এয়াজ উদ্দিন	জেনাতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৯.	কাশেম পাগলা	পাগলা ব্যাপারী	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬০.	আজদ্দিন	বাসবুড়া	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬১.	নছিমন	আজুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬২.	মহিজন	কছিমুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৩.	মেহেরজন	এজাবুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৪.	কান্দুরা	বেংগু ফকির	গুজিমারী	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৬৫.	আনছার	বেংগু ফকির	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৬.	জয়েন উদ্দিন	ময়েন ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২৬৭.	সাহাদুল সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৬৮.	বাবর উদ্দিন	সাহাদুল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৬৯.	বক্তার আলী	সাহাদুল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭০.	ছোবহান	আলিম	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭১.	কাদের আলী	হেসকারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭২.	ছাবেদ আলী	শরু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৩.	মোহাম্মদ আলী	মেছের আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৪.	পয়জার আলী	ওসমান আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৫.	বানু সেখ	বাবর আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৬.	বক্তার আলী	রজব আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৭.	সংসার আলী	ঠাকাল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৮.	মশুল সেখ	জহদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৯.	তছলিম উদ্দিন	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮০.	তহফেল হক	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮১.	মোজাম্মেল হক	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮২.	আঃ ছাত্তার	ছলিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৩.	মেজা সেখ	পাগলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৪.	মোজাম্মেল মুন্সি	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৫.	কাশেম আলী	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৬.	এশার আলী	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৭.	মহাদ্দিন	অমতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৮.	ইবরা সেখ	শলক ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৯.	আজিমুদ্দিন	গেন্দলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৯০.	আব্বাস	গেন্দলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৯১.	আঃ হাফিজ	আছান আকন্দ	রামখানা	হাতিয়া
২৯২.	ইয়াকুব	মিয়াজদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৩.	পয়জার	আফান সেখ	রামখানা	হাতিয়া
২৯৪.	ফজল সেখ	হাসু সেখ	রামখানা	হাতিয়া
২৯৫.	ছপিয়ল	জহির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৯৬.	আজিজল	মহিম	রামখানা	হাতিয়া
২৯৭.	বনিরুদ্দিন	নাজিবুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৮.	গহুর দেওয়ানী	নাছির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৯.	টেপরী বেগ	মগহুর উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩০০.	কেনছার	মতি সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩০১.	আবুল হোসেন	কেরামত আলী	রামখানা	হাতিয়া
৩০২.	হাবিবুর রহমান	নজিবুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩০৩.	আঃ হাকিম	বাছের সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩০৪.	পাগলা সেখ	কাঞ্চিয়া	রামখানা	হাতিয়া
৩০৫.	করিম বক্স	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩০৬.	রোস্তম	করিম বক্স	রামখানা	হাতিয়া
৩০৭.	আঃ রহমান	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩০৮.	এজা সেখ		রামখানা	হাতিয়া
৩০৯.	মেহের উল্যা	গমির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১০.	কাচু সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১১.	মাছু সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১২.	আকবর সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১৩.	জব্বার সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১৪.	আজুরুদ্দীন	আমিরুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৫.	আঃ ছাত্তার	বাছের সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩১৬.	কাশেম	মহিজ উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৭.	মজিবর	মিছুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৮.	মজাহার	জহুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৯.	শুটকু	বেড়া ভাংগা	রামখানা	হাতিয়া
৩২০.	কলমদী	ক্যাশক	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২১.	মনি সেখ	টুনি মামুদ	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২২.	নৈমুদ্দীন	খৈমুদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৩.	আবুল	আমুদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৪.	জব্বার	কছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৫.	আকবর	কছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৬.	মোন্তাজ	বেংগু	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩২৭.	এমাজ	নজি বুড়া	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৮.	আলিফ উদ্দিন	আব্দুল	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৯.	হোসেন	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩৩০.	লাল মিয়া	আছুরুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩৩১.	মোহাম্মদ আলী	পোয়াতু মিয়াজী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩২.	শহীদ আবু বক্কর	কালে মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৩.	আজগার আলী	ফজল উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৪.	উমর আলী	মিছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৫.	আজাহার আলী	ফজল উদ্দিন ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৬.	ভেদু সেখ	মিছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৭.	জবেদ আলী	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৮.	খেরু সেখ	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৯.	হযরত আলী	আশরাফ উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪০.	কাজিম উদ্দিন	বাসারতুল্যা ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪১.	কল্পনা বাসপো	ভবিশ বাসফো	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪২.	ইব্রাহীম আলী	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৩.	সমসের আলী	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৪.	আনছার মানু	আছর উদ্দিন ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৫.	বাবু মিয়া	আপান তেলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৬.	মহদ্দিন	আকদ্দি শিকারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৭.	আফজাল হোসেন	হেদেল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৮.	আজিত	ভাণ্টু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৯.	বাবর আলী	মতি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫০.	মঙ্গল ঠাকুর	দেবেন ঠাকুর	বোনারপাড়া	হাতিয়া
৩৫১.	আকবর আলী	আকাদ্দ সরকার	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫২.	এলাদ্দিন সেখ	আপতান	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৩.	গেনছার আলী	সজর উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৪.	খচিয়ত উল্যা	জহির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৫.	গহুল	টুংসু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৬.	কপদ্দিন	বৈরাগী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৭.	খয়বার আলী	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩৫৮.	আহম্মেদ আলী	রুমাল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৯.	কাচুয়া সেখ	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৬০.	আমুদ্দিন	এছান তেলী	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬১.	ছপর মৌলভী	এছান তেলী	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬২.	আমজাদ আলী	আমিন উদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৩.	আমিন উদ্দিন	হেদল সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৪.	আপাজ উদ্দিন	ছফর মৌলভী	আইরকাঠি	হাতিয়া
৩৬৫.	আজিমুদ্দিন	হারাধন মামুদ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৬.	আলিমুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৭.	আঃ জালাল	হায়পুদ্দিন (ভালকা)	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৮.	নেস মামুদ	হারাধন মামুদ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৯.	ধনিয়া সেখ	টোরা সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭০.	বাবর আলী	টোরা সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭১.	আজি সেখ	ভাণ্টু সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭২.	আবদাল হোসেন	মিছির উদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৩.	চিনি সেখ	আজিজর সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৪.	নছিয়তুল্যা	মাদু সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৫.	কাচুয়া সেখ	নেদা তেলী	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৬.	আকতার হোসেন	গাদলু সেখ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৭.	বাহাউল্লা	খতি মিঞাজি	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৮.	আকবার আলী	গেনলা সেখ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৯.	ভোলা সেখ	সাজিম তেলি	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮০.	আব্দুল	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮১.	ছমচল	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮২.	এছাহাক	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৩.	ফুকতুল সেখ	ছফর উল্যা	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৪.	নকর আলী	কচের আলী	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৫.	বাহের আলী	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৬.	মোঃ আবুল হোসেন	খবির উদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৮৭.	আনছার আলী	মতি উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৮৮.	কমর উদ্দিন ব্যাপারী	হাজী মেহের উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩৮৯.	কোবান আলী	দেয়ানতুল্যা ব্যাপারী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯০.	আঃ রহমান	রহমতুল্যা ব্যাপারী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯১.	শিশু বাচ্চা	আঃ রহমান	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯২.	সৈয়দ আলী	কচিম উদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৩.	মোছাঃ মোনামাল	করিম উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৪.	মোঃ ফরজ উল্যা	কালে মামুদ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৫.	মোঃ ফারাজ উল্যা	নিশপতুল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৬.	মহির আলী	ফরাজ উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৭.	মোঃ বিবুরুদ্দি	ঐ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৮.	মোঃ এজাব উদ্দিন	ঐ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৯.	মোঃ চান মিয়া	সহির আলী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০০.	মোঃ মজিবর রহমান	এবারতুল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০১.	আঃ লতিফ	মসিজুদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০২.	টোনেয়াল	খাদু মামুদ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৩.	আকালু সেখ	খোশে মামুদ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৪.	তমিজ উদ্দিন	পরবাসু	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৫.	আছর উদ্দিন	টোনেয়া সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৬.	দারোপ আলী	বছদ্দিন তেলী	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৭.	আমাদ্দিন	গুগরু সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৮.	মজিবর রহমান	গুগরু সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৯.	হফেজ উদ্দিন	পরবাসু	শ্যামপুর	হাতিয়া
৪১০.	আব্দুর রহমান	আরিফ উদ্দিন	হিঃ গোপপাড়া	হাতিয়া
৪১১.	শরফেন বেওয়া	ধনাই	মালচার পাড়	হাতিয়া
৪১২.	আঃ জব্বার	অহদ্দি সেখ	মালচার পাড়	হাতিয়া
৪১৩.	লোকমান হোসেন	সৈয়দ আলী মুন্সী	কাকড়িরচর	হাতিয়া
৪১৪.	হাছিম সরদার	বাবন সরদার	কাকড়িরচর	হাতিয়া

(অসম্পূর্ণ)

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

হাতিয়া গণহত্যায় নির্যাতিত এবং সে সময় ঐ এলাকায় অবস্থান নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা অনেকে এখনও জীবিত আছেন। এ গণহত্যায় যারা শহীদ হয়েছিলেন এবং যারা নির্যাতিত তারা বেশিরভাগই দাগারকুটি, অনন্তপুর, কুটির পাড়, হিজলি গোপপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে অধিবাসী। এই গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ও এই গণহত্যা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার থেকেই ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতের নিম্নোক্ত চিত্রটি পাই :

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামী	গ্রাম	বিবরণ
১.	মোঃ বাবর আলী	মোঃ আনসার আলী	অনন্তপুর	পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা গুলিবিদ্ধ
২.	শাহের আলী	মোঃ আনসার আলী	অনন্তপুর	পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা গুলিবিদ্ধ
৩.	মোঃ সুলতান আলী	মৃত ওছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	শারীরিকভাবে লাঞ্চিত
৪.	মোঃ কামালউদ্দিন	শহীদ বাবর উদ্দিন	রামরামপুর	নিজ পিতা শহীদ ও নিজে গুলিবিদ্ধ
৫.	জরিনা বেওয়া	পয়জার আলী	রামখানা	স্বামী নিহত
৬.	ময়জন বেওয়া	আলীমুদ্দিন ব্যাপারী	নীলকণ্ঠ	স্বামী নিহত
৭.	ফজিলা বেওয়া	জোবেদ আলী	অনন্তপুর	স্বামী নিহত
৮.	একাব্বর আলী	হযরত আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত
৯.	রোকেয়া বেগম	হযরত আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত
১০.	ফজলু হক	জাবেদ আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত

(অসম্পূর্ণ)

নির্যাতিতদের মৌখিক ভাষ্য

মোঃ বাবর আলী (৮৫)

মোঃ বাবর আলী

পিতা : মোঃ আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

ঐদিন ছিল শনিবার। ভোরবেলা প্রচুর গোলাগুলি ও মানুষের চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি অনন্তপুর বাজার ও গ্রামের বাড়িঘরে খানসেনারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধরছে এবং মারপিট করছে এবং গুলি করে মারছে। আমি মাসহ পালাতে চেষ্টা করি। আমরা বাড়ির পাশের ঝোঁপে লুকানোর চেষ্টা করি। মা আমাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখেন। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাই এবং তারা আমাকে মারধর শুরু করে। আমাদের বাড়িতে তখনও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পোস্টার ছিল। নৌকা মার্কা পোস্টারগুলো ওরা ছিঁড়ে ফেলে ও পুড়িয়ে দেয়। আমার ঘরে তখন বাঁধাই করা তিনটি ছবি ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শেখ মুজিবের ছবি। খানসেনারা শেখ মুজিবের ছবিতে গুলি করে ঝাঁঝড়া করে দেয় ও মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে। আর বাকি দুটো ছবি ওরা নিয়ে যায়। ওরা আমাকে গুলি করে এবং তা আমার শরীরের তিনটি স্থানে লাগে। কিন্তু তিনটি গুলি খাওয়ার পরও আমি বেঁচে আছি। গুলি লাগার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। আমাকে কুড়িগ্রামে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এদিকে আমাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, গরু-বাছুর সব কিছু ওরা পুড়িয়ে

গণহত্যা ১৯৭১

এবং লুট করে শেষ করে দিয়ে যায়। আমার জীবিত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমাদের পরিবারের ঐ সাতটি লাশের কবর দেওয়ার সাথে সাথে আমার জন্যও একটা কবর খুঁড়ে রাখে। কারণ, আমার যা অবস্থা ছিল সেখান থেকে বেঁচে আসাটা ছিল অকল্পনীয়। যাহোক, তারপর থেকেই আমি অসুস্থ এবং প্রায় পঙ্গু।

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে ঠেলা গাড়ি
ভাস্কর্য, লোহা

মোঃ শাহের আলী (৭৫)

পিতা : মৃত আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : পুরাতন অনন্তপুর বাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

পেশায় কৃষিজীবী এই সহজ সরল প্রকৃতির মানুষটি সেদিনের বীভৎসতার আতংক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। একই পরিবারের সাতজনকে হারিয়ে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের শিকার এই মানুষটি এখন নিস্তেজ প্রায়। ঐদিন ভোর থেকে প্রায় আসরের আজান পর্যন্ত চলা গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটক ছিলেন এবং নির্যাতিত হন। ছোটখাট এই মানুষটি স্বচক্ষে দেখেছেন সেই নারকীয় গণহত্যা। শাহের আলীর বর্ণনায় :

একাত্তরে আমি একজন কৃষক ছিলাম। ভোরবেলা গুলির আওয়াজে ঘর থেকে বের হয়ে যেই রাস্তায় যাই, দেখি পাকিস্তানি বাহিনী সব ঘরে আগুন দিচ্ছে ও যাকে সামনে পাচ্ছে মারধর করছে। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তাদের গুলি করে মারছিল। এসব দেখে আমি ভয়ে নদীর দিকে দৌড়াতে থাকি। কিন্তু ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাকে পেটাতে থাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল,

মোঃ শাহের আলী

তুম মুক্তি? কিউ পালাতে হো? মুক্তি কিধার? আমার বুকে, মুখে, পিঠে ওরা বুটদিয়ে লাথি মারতে থাকে। এদিকে আমার চোখের সামনেই ওরা অনেককে গুলি করে মেরে ফেলে। তারপর আমাকে ধরে নিয়ে যায় দাগারকুটি। ওখানে আরও বহু লোকজনকে ধরে নিয়ে আসে। ওখানে পাশের গ্রামের অনেক মানুষ ছিল। আমাদের সবাইকে ধল্লা (ধরলা) নদীর কাছাকাছি একট ঢালু জায়গায় লাইন করে দাঁড় করায়। আবার আমাকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে আসে ও আবার মারপিট করে অন্য একটি সৈন্যদের দলের হাতে ছেড়ে দেয়। এভাবে প্রায় বিকাল ৪টা-৫টা পর্যন্ত ধরে রাখে ও মারপিট করে। ওরা আমার বাম পায়ে একটা গুলি করেছিল। আমাকে এত মারধর করার ফলে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি হাসপাতালে। নিজের চোখে দেখেছি ওরা কমপক্ষে তিনশ-চারশো মানুষকে শুধু দাগারকুটিতেই গুলি করে মেরেছে। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। যুদ্ধের পর থেকেই আমি অসুস্থ। আমার এক পাশ পড়ে গিয়েছে (প্যারালাইজ্‌ড)। আমার শরীরে এখনও যন্ত্রণা হয়।

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে গাড়ি
ভাস্কর্য, মিশ্র মাধ্যম

মোঃ কামাল উদ্দিন (৬০)

পিতা : শহীদ বাবর উদ্দিন, গ্রাম : রাম রাম পুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

মোঃ কামাল উদ্দিন যুদ্ধের সময় ১৫ বছরের একটি কিশোর। ঐসময় তাদের বাড়ি ছিল অনন্তপুর গ্রামের কুটিরপাড়, যা এখন ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে বিলীন। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতিয়া অপারেশনে

মোঃ কামাল উদ্দিন

কামাল উদ্দিনের পিতা শহীদ হন এবং তাদের পরিবারের আরও অনেকে শহীদ ও নির্যাতিত হন। কামাল উদ্দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত। তাঁর শরীরে এখনও পাঁচটি গুলির চিহ্ন বিদ্যমান। ঐদিনের নৃশংসতা, নির্যাতন ও ভয়াবহতার স্মৃতিচারণে কামাল উদ্দিন বলেন :

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। পাকিস্তানি আর্মি গ্রামের মধ্যে ঢুকে বাড়িঘর, দোকানপাট, গোয়ালঘর, খড়ের গাদা সবকিছুতেই আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাণভয়ে আমি নদীর দিকে দৌড়াতে থাকি। কিন্তু আমি ওদের হাতে ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাকে বেদম পেটাতে আরম্ভ করে। আমি কান্নাকাটি করছি আর আমাকে ওরা আরও মারছে। বুট দিয়ে মুখে লাথি মারলে আমার নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে যায়। এরপর ওরা আমাকে নিয়ে যায় ধল্লার (ধরলা) কাছে দাগারকুটি গ্রামে। ওখানে অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেককে ধরে এনেছিল। তারপর আমাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। আমরা প্রায় সাতশ-আটশ লোক ছিলাম। তারপর ওরা আমাদেরকে গুলি করে। এতে অনেক মানুষ, প্রায় চারশ হবে, মারা যায়। এরপরও ওরা অনেককে গুলি করে মারে। যারা গুলি খেয়েও বেঁচে ছিল এরকম অনেককে খানসেনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। খান সেনাদের এই আক্রমণে আমার বাবা, মামাসহ আমাদের পরিবারের ছয়জন সদস্য সেদিন নিহত হয়। সেদিনকার নির্যাতন ভুলে যাওয়ার মত নয়। নদীভাঙনের ফলে ঐ গ্রাম (দাগারকুটি) আর নেই এবং আমাদের গ্রামের (কুটির পাড়) লোকজনও সব বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে।

মোঃ সুলতান আলী (৫৮)

পিতা : মৃত ওছিমুদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ ব্যবসাঘর, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫।

মোঃ সুলতান আলী হাতিয়া গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতিত ব্যক্তি। ১৯৭১ সালে পনের বছর বয়সী একজন কিশোর হিসেবে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতার যে চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন তার বিবরণ দিলেন এভাবে :

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১ আমি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনন্তপুর বাজারে রাত্রে ছিলাম। ভোর বেলা পশ্চিম দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হঠাৎ করে গুলি করে। ঐ শব্দ শোনার পর ঘুম থেকে

জেগে উঠি। দোকানের বাইরে এসে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি পাকিস্তানি সেনারা বাজারের নিকটে এসে গেছে। এমন অবস্থায় আমি দোকানে তালা লাগিয়ে বাজারের পূর্বে আমাদের বাড়িতে চলে যাই এবং সবাইকে এই খবর দিই। সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই। পরে আমি আমার বই-পুস্তক ও আমার কাছে থাকা বাংলাদেশী পতাকা একটি ট্রাংকের মধ্যে নিয়ে বাড়ির কাছেই একটি গর্তের মধ্যে লুকাই। এরই মধ্যে আমি শুনতে পাই অনন্তপুর বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী বলছে, জ্বালাও, আগ লাগাও, কাহাছে মুক্তি, খোঁজো। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের বাড়ির মধ্যে চলে আসে এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর বলতে থাকে কাহাছে মুক্তি, খোঁজো, আগ লাগাও। আমি প্রাণের ভয়ে ঐ গর্ত থেকে উঠে বাড়ির পূর্ব দিকে দৌড় দিই। বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে ওরা। আমি ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাই। পরে ওখান থেকে উঠে পাশেই আমার এক চাচার বাড়িতে দরজার পিছনে গিয়ে লুকাই। ওখান থেকে আমি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ি। আমাকে নিয়েই ওরা বামনি নদীর পাশে মাস্টারের বাড়ির কাছে নিয়ে যায় এবং ওখানে সবাই এক হয়ে প্রচুর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে এবং আশেপাশে যাকেই পেয়েছিল তাকেই গুলি করে মেরে ফেলে। ওখানে বসে থাকাকালীন ওরা আমার গলায় গ্রেনেড ঠেকায় এবং অন্য খানসেনা আমার গলায় বন্দুকের নল ধরে রাখে। কিন্তু গুলি করে নি। অন্যরা আমাকে বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে যেমন, কাহাছে মুক্তি হ্যায়, কিধার রেহেতা হ্যায়, কখন আসে, কী রকম অস্ত্র নিয়ে আসে। আমি যতটুকু পারি কৌশলে উত্তর দিতে থাকি। তা আমাকে ওরা বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। ওরা অপারেশন শেষ করে চলে যাবার আগে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাড়ির দিকে রওনা দিই।

মোঃ সুলতান আলী

বৃদ্ধ মাকে নিয়ে শরণার্থী হিসেবে দেশ ত্যাগ

এমন সময় আমাদের মুক্তিবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে গুলি ছুঁড়লে তিনজন খান সেনা নিহত হয়। পরে পাকিস্তানি বাহিনী যখন দক্ষিণ দিকে রওনা দেয় তখন আবার ওদের হাতে ধরা পড়ি। ওখান থেকে ওরা আমাকে কৈলাশের ভিটা, হাতিয়ার বিল পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। সেখানে ওরা আমাকে চড় মারে এবং বুট দিয়ে আমার মুখে লাথি মারে। তারপর ওরা আমাকে দাগারকুটি গ্রামে ধরে নিয়ে যায়। ওখানে কিছু রাজাকারও ছিল যেমন, সাইদুর মাওলানা, আকবর, আরো অনেকে। ওখানে আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে এবং কিছুক্ষণ পর বসন্ত ও প্রশান্ত কবিরাজের বাড়ির পাশে নিয়ে যায়। ঐ বাড়ির পাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনা লোকজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। আমাকে প্রথম যারা ধরেছিল, তারা বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। এখানে সব খানসেনা উপস্থিত ছিল। ধরে আনা লোকজনের মধ্যে আমার বাবা ও এক চাচা শাহের আলীও ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী ওদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। কমপক্ষে তিন-চারশো লোক এখানে শহীদ হন। আমাকে ওরা ধরে নিয়ে লালমনিরহাটের দিকে রওনা দেয়। পরে রাস্তার মধ্যে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি সব কিছু শুধু ছাই হয়ে পড়ে আছে। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। এরপর আমার বাবা ফিরে আসেন। আমি ও আমার বাবা এবার খুঁজতে বের হই পরিবারের অন্যরা কে কোথায় আছে তা জানার জন্য। এমন সময় নদীর ধারে দেখি আমার এক চাচা বাবর আলী তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে 'গ্যাংড়াইতেছেন' এবং পানি পানি বলে চিৎকার করছেন। আমরা তাকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করি। এই আক্রমণে আমাদের সাতজন আত্মীয়-স্বজন শহীদ হন। আমি যে বেঁচে আছি, এটা মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই। বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারা কুকুর শেয়ালের মত মানুষ মারছে। চোখের সামনেই এই বিরাট গণহত্যা আমাকে সব সময় কষ্ট দেয়। সরকার যে বিচার করছে (যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার) সেখানে এখানকার দালালদের বিচার করা হোক।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

মোঃ মনসুর আলী

মোঃ মনসুর আলী (৬০)

পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ মনসুর আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি খায়রুল আলম কোম্পানির সাথে উলিপুরের বিভিন্ন স্থানে, চিলমারী, দুর্গাপুরসহ এতদ্ অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানে অংশ নেন। তাদের কোম্পানির একটি গ্রুপের দুটো ক্যাম্প ছিল নতুন অনন্তপুর গ্রামের বছির ব্যাপারী ও আজিমুদ্দিন সরকারের বাড়িতে। পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতিয়া অপারেশনের সময় তিনি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই নিরাপদ অবস্থানে চলে যান। পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন শেষ করেই চলে যাওয়া মাত্রই তিনি দাগারকুটি ও অনন্তপুর গ্রামে আসেন। সেই ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর নিজ বয়ানে:

একাত্তরের শরণার্থী

আমার বয়স তখন ১৬ বছর। আমি অনন্তপুর, দাগারকুটি গ্রামের কিছু দূরে মধুপুর গ্রামে অবস্থান করছিলাম। স্থানীয় রাজাকাররা মূলত আমাদেরকে (মুক্তিযোদ্ধাদের) মারার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনীকে ডেকে আনে। আমি দূর থেকে ওদের অস্ত্রশস্ত্র দেখেছি। পাকিস্তানি বাহিনী অনন্তপুর বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর আশপাশের বাড়িঘরেও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বেশ কয়েকজনকে ওখানেই হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি গ্রুপকে টার্গেট করে শওকত ভাইরা (মুক্তিযোদ্ধা দল) দক্ষিণ দিক থেকে গুলি ছুঁড়লে তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর এরা পাগলা

কুত্তার মতো এলাকার সাধারণ জনগণকে হত্যা করতে শুরু করে। অনন্তপুর, দাগারকুটিসহ আশপাশের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে এরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য গ্রামবাসীদের ধরে দাগারকুটি গ্রামে নিয়ে আসে। এই কাজে স্থানীয় রাজাকার বাউরাত আলী, শহিদুর মাওলানা, আব্দুল মজিদ, শাহজাহান, আকবর আলীসহ অনেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে। যে গ্রামে নিয়ে (দাগারকুটি) সাধারণ জনগণকে হত্যা করা হয় ঐ গ্রামটিতে অনেক রাজাকার ছিল। এই রাজাকারদের সহায়তা নিয়ে ধরে আনা গ্রামবাসীদেরকে সারি করে দাঁড় করিয়ে খানসেনারা ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে।

হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পরপরই আমি এলাকায় ঢুকি। দেখি শুধু লাশ আর লাশ। বাড়িঘর, দোকাপাট সব আগুনে পোড়া। যেসব লাশকে তাদের পরিবারের লোকেরা চিনতে পেরেছে সেগুলোর কবরের ব্যবস্থা হয়েছিল আর বাকিগুলো কবরস্থ করা সম্ভব হয়নি। একই গর্তে অনেকগুলো করে লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। অনেক লাশ ধরলার পানিতে ভেসে যায়। আমি হাতিয়া গণহত্যায় শহীদদের তালিকা সংগ্রহের কাজে ৬৯৭ জন শহীদের তথ্য পাই।

তথ্য সংগ্রহকারীর ভাষ্য

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫)

পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫।

১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ৬নং সেক্টরাধীন দিনাজপুর, পঞ্চগড় অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। দেশ স্বাধীন হলে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং তারপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে হাতিয়া গণহত্যা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কাজ শুরু করেন। একটানা ২২ বছর ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করা নিবেদিতপ্রাণ এই মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য :

যুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় ডা. বাবর আলী, মনসুর আলী, মাওলানা আকবর, শহিদুর মাওলানা, আব্দুল মজিদ প্রমুখ এপ্রিল মাসের শেষ দিকে অনন্তপুর বাজারে একটা সভা করে। সভায় উপস্থিত সবাইকে গরু জবাই করে খাওয়ানো হয়। এই সভাতেই ডা. বাবর আলীকে প্রধান করে হাতিয়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। তারা এলাকার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হুকুম দেয়। যদি কেউ কথা না শোনে তবে তাকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দিতে থাকে। কিন্তু, হাতিয়ার মানুষ তাদের কথার তোয়াক্কা করে নি। শুধু এই হাতিয়া ইউনিয়নেই তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৩ জন। তালিকার বাইরেও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আছেন। এই ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি ক্যাম্প ছিল মুক্তিবাহিনীর এবং হাতিয়াবাসীও মুক্তিযোদ্ধাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করেছে। এ বিষয়টি স্থানীয় রাজাকার, দালালদের জন্য খুব মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা একটা উছিলা খুঁজছিল। এর মাঝে উলিপুর থানার পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা ও শান্তি কমিটির লোকজন অনন্তপুর বাজারে এসে স্থানীয় লোকজনকে একত্র করে একটা মিটিং করে। মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকে, নদীর ওপাড় থেকে কিভাবে আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা দুর্গাপুরের ব্রিজ নষ্ট করে দেয়, উলিপুর হানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করে, বালারহাট ও মণ্ডলারহাটে খানসেনাদের মোকাবিলা করে। এই সুযোগে যারা শান্তি কমিটির স্থানীয় বড় ধরনের দালাল ছিল, তারা এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য উলিপুরে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে যোগাযোগ করে।

সেদিন ছিল ২৭ রমজান, ১৩ নভেম্বর। ভোরবেলা খান সেনারা ও রাজাকার, দালাল একসাথে অনন্তপুর বাজারে চলে আসে। বাজারে ও আশপাশে তারা যেসব গ্রামবাসীকে পাই, তাদেরকে

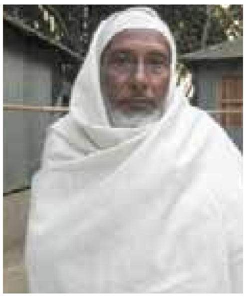

মোঃ মিজানুর রহমান

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে দরজা ভাস্কর্য

মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ দিতে বলে। যারা উত্তর দিতে পারেনি, তাদের অনেককে ওরা দাগারকুটি গ্রামে ধরে নিয়ে হত্যা করে। এছাড়া অনেককে বেদম পেটায়, বিশেষ করে নবীনদের। এরই মধ্যে আমাদের গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর খানসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। আবু বকর তাঁর বাবা-মার সাথে দেখা করতে এসেছিল আগের দিন রাতে। খানসেনারা প্রথমে ওদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওকে প্রচুর মারপিট করার পর ওর বাবা-মার সামনে হাত-পা বেঁধে ঐ আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা তিনদিক থেকে গুলি করতে আরম্ভ করলে তিনজন খানসেনা নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ঐ তিনদিকের গ্রামগুলোর মধ্যে ঢুকে যাকে পেয়েছে তাকেই ধরে নিয়ে যায় দাগারকুটি গ্রামে। এখানেই সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। তারপর ব্রাশফায়ার করে ওদের উপর। এখানেই প্রায় চারশো গ্রামবাসী শহীদ হন। যারা গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছিল, তাদের অনেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এই গণহত্যা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছি যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার মিলে দাগারকুটি গ্রামে ও আশপাশের গ্রামগুলোতে ৬৯৭ জনকে হত্যা করে। এসব মৃতদেহের একটা বড় অংশের কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কবর দেওয়ার জন্য যে আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র কাপড় লাগে তা আশেপাশে পাওয়া যায়নি। ওরা সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। একই দিনে মণ্ডলারহাটে হামিদ মাওলানার রাজাকার দল চারজন মুক্তিযোদ্ধাকেও হত্যা করে। পুরো অঞ্চল জুড়ে শুধু রক্ত, লাশ আর হাহাকার ছিল। এখানে বেশিরভাগ লাশকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। অনেক লাশ ধরলার পানিতে ভেসে যায়।

সংরক্ষণ প্রয়াস

দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাতিয়া গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। প্রথমদিকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মিজানুর রহমানের সাথে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত পরিবারের কিছু সদস্য ১৩ নভেম্বর দাগারকুটি বধ্যভূমিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। ১৯৮২ সালে বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা সর্বপ্রথম এই স্মৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। কমান্ডার মিজানুর রহমান, মোঃ মনসুর আলী, মোঃ শামসুল আলমসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার উদ্যোগে হাতিয়া গণহত্যায় শহীদ ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়নের যে কার্যপ্রচেষ্টা চলছিল, তা আরও গতিশীল হয় এই উদ্যোগের সাথে প্রশিকার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

প্রশিকা কর্মকর্তা আবু সাঈদ এবং পূর্বোল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে হাতিয়া গণহত্যায় শহীদ এমন ৬৯৭ জনের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৮৫ সালে দূর্বৃত্তরা প্রশিকার উলিপুর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করলে শহীদদের ঐ তালিকাটি পুড়ে যায়। আবু সাঈদের সহযোগিতায় দাগারকুটি বধ্যভূমিতে প্রথমবারের মতো একটি স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়। কিন্তু নদীভাঙনের ফলে দাগারকুটি গ্রামের সাথে স্মৃতি স্থাপনাটিও বিলীন হয়ে যায়। তারপর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ও বেশকিছু তরুণ চাঁদা তুলে হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয়ের পাশে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও সংস্কারের অভাবে এটির জীর্ণদশা স্থানীয় শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কষ্ট দেয়। এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

অনন্তপুর বাজার সংলগ্ন জেলা পরিষদ নির্মিত হাতিয়া শহীদ স্মৃতি ফলক

অবশেষে ২০০৬ সালে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত 'হাতিয়া গণহত্যা দিবস'-এর আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, কেউ ভূমিদান করলে তিনি অতিসত্তর একটি স্থাপনা নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ ঘোষণা আসার পর কমান্ডার মিজানুর রহমান অনন্তপুর বাজার সংলগ্ন নিজ জমির দুই শতক পরিমাণ জমি স্মৃতিস্থাপনার জন্য

দান করেন। ঐ জমিতেই জেলা পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সালে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এই স্মৃতিফলকটি গণহত্যার প্রধান স্মৃতিচিহ্ন।

প্রতিবছর ১৩ নভেম্বর এখানে হাতিয়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এখনও পর্যন্ত মূলত স্থানীয় উদ্যোক্তারা হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তার এই দিনটি পালন করে থাকেন। তবে সম্প্রতি হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএম আবুল হোসেনের প্রচেষ্টায় উপজেলা ও জেলা প্রশাসনও ইতিবাচক সাড়া প্রদান করছে। সাম্প্রতিককালে বেশকিছু গণমাধ্যম হাতিয়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে প্রতিবেদন ও প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছে। তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষের দাবি, হাতিয়া গণহত্যা দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হোক এবং এই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য পাঠাগার নির্মাণ, সরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ও রাস্তাঘাটের নাম শহীদের নামে নামকরণ ও নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্ত শহীদ পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকা'র উলিপুর শাখা স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আশির দশকের শুরুতেই হাতিয়া গণহত্যায় শহীদানের তালিকা প্রণয়নের কাজে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে প্রশিকা'র উলিপুর কার্যালয়ও এ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল এর পুনর্বাসন কার্যক্রম। হাতিয়া গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রথমে প্রশিকার পক্ষ থেকে চাল বিতরণ করা হয়েছিল। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত কিছু নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। কিন্তু, এই ধরনের সাহায্য দীর্ঘমেয়াদে তেমন কার্যকরী হবে না ভেবে প্রশিকার শাখা কর্মকর্তা আবু সাঈদ আরও চেষ্টা চালাতে লাগলেন। মূলত তাঁরই পরিকল্পনায় প্রশিকা হাতিয়া অপারেশনে ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে গৃহ নির্মাণসামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, সাঈদ ভাই ব্যক্তিগতভাবেও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। এসব কাজের জন্য প্রশিকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু, এই জনপ্রিয়তা স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে ভীত করে তোলে। তারা ষড়যন্ত্র করে ১৯৮৫ সালে প্রশিকার উলিপুর কার্যালয় ভস্মীভূত করে।

বর্তমান অবস্থা

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বরে দাগারকুটিতে সংঘটিত গণহত্যার মতো দাগারকুটি গ্রামটিও আজ একটি স্মৃতি। ধরলার তীরবর্তী দাগারকুটি আজ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই ধরলা নদীও আজ আর ওখানে নেই। ব্রহ্মপুত্র নদ ধরলাকে গ্রাস করেছে এবং কুড়ের পাড় গ্রামটিও আজ প্রায় বিলীন। এই গ্রামগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ অধিবাসী বিভিন্ন স্থানে (উলিপুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। ফলে, তৎকালীন কোন স্মৃতিচিহ্ন বা শহীদদের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মূল্যায়ন

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন রচিত *ইতিহাস দখলের ইতিহাস* গ্রন্থ ও তাঁর বিভিন্ন লেখায় এদেশে ইতিহাসের উপাদান ধ্বংসের সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস বিমুখ প্রজন্ম তৈরি করার নীলনকশা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু, অন্তিমে সে গুড়েবালি। ইতিহাস তার নিজ গতিতেই ফিরে আসে, আসবে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে হাতিয়া গণহত্যার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, হাতিয়া গণহত্যা সংঘটিত হয় রাজাকার অধ্যুষিত দাগারকুটি গ্রামে। দ্বিতীয়ত, গণহত্যা সংঘটনকারী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীকেই চিহ্নিত করা হয়। তৃতীয়ত, এই গণহত্যা আকস্মিকভাবে সংঘটিত। গ্রামবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা নির্বিচার গণহত্যার শিকার হয়। চতুর্থত, এই গণহত্যায় সীমাহীন নৃশংসতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় দশ ঘণ্টাব্যাপী এই বিরাট গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ। পঞ্চমত, এই গণহত্যায় কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, বরং বাঙালি নিধন ছিল মূল লক্ষ্য। গণহত্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরো রয়েছে– ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যখন সিয়াম সাধনার জন্য সেহরি খেয়ে উঠেছে, তখনই পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে। এই হচ্ছে এদের ধর্মপরায়ণতার নমুনা।

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর হাতিয়াবাসীর জন্য অভিশপ্ত দিন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার শিকার এই গ্রামগুলোর অধিবাসী প্রতিনিয়তই সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারগুলো সেই ধকল আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নির্যাতনের শিকার বা অন্যভাবে ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নারী নির্যাতন নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে নারাজ। ধারণা করা হয়, এ বিষয়টি তারা ভুলে যেতে চান।

হাতিয়া গণহত্যা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের অভাবে এই অঞ্চলের সব পর্যায়ের মানুষকে আঘাত করেছে। এ অঞ্চলে এখনও সেইসব রাজাকার ও দালাল এবং তাদের বংশধর ও বশংবদরা বেশ প্রভাবশালী। তারা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক চাওয়া, হাতিয়া গণহত্যার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

মুক্তিযুদ্ধ ও হাতিয়া গণহত্যা এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে প্রবীণদের মধ্যে প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু দৃশ্যমান স্থাপনার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের অভাব ও সরকারি উদাসীনতার ফলে এলাকার নবীন প্রজন্ম এই আত্মত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। যারা নিজ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে না, তারা মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস জানবে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা বাতুলতা বৈ কিছু না। তাই, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সময়ের জোরালো দাবি। এ দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে ঐতিহাসিকভাবেই ইতিহাস বিমুখ বাঙালি জাতি নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে।

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

হারুন হাবীব (সম্পা.), *বাংলাদেশ : ১৯৭১ গণহত্যা প্রতিরোধ স্বাধীনতা*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০০

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

শফিউদ্দিন তালুকদার, *একাত্তরের গণহত্যা যমুনার পূর্ব-পশ্চিম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

এ এস এম সামছুল আরেফিন (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), *রাজাকারদের তালিকা বৃহত্তর রংপুর জেলা*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৯

সাক্ষাৎকার

মোঃ বাবর আলী (৮৫), পিতা : মোঃ আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ শাহের আলী (৭৫), পিতা : মৃত আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : পুরাতন অনন্তপুর বাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ কামাল উদ্দিন (৬০), পিতা : শহীদ বাবর উদ্দিন, গ্রাম : রাম রাম পুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ সুলতান আলী (৫৮), পিতা : মৃত ওছিমুদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ ব্যবসাঘর, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫

মোঃ মনসুর আলী (৬০), পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫), পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ শামসুল আলম (৬২), পিতা : মৃত মনির উদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

বিএম আবুল হোসেন (৩৬), পিতা : মৃত বাদশা মিয়া, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫

ঋণস্বীকার

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫), পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ মনসুর আলী (৬০), পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ শামসুল আলম (৬২), পিতা : মৃত মনির উদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

বিএম আবুল হোসেন (৩৬), পিতা : মৃত বাদশা মিয়া, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ আলামিন সরকার (আপন), পিতা : মোঃ আঃ ছামাদ, গ্রাম : বাগুয়া অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

তথ্যসূত্র

[১] Kalyan Chaudhuri (1972), Genocide in Bangladesh. London. Orient Longman, PP. 199-2002

[২] সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা, সংখ্যা ৭০, *রাও ফরমান আলী : পাকিস্তানি জেনারেল ও ১৯৭১*, মুনতাসীর মামুন, পৃ. ৬৯।

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬

[৪] *ঐ, পৃ.৭৫*

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৪৮.	আজিমুদ্দিন	এছান সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৪৯.	আলিমুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫০.	আফাজুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫১.	আমিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
৫২.	শহর মৌলভী		অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৩.	ছোট কাচুয়া	নেস মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৪.	নেস মামুদ	হারাধন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৫৫.	আমজাদ আলী	আজুদ্দি	সাতভিটা	হাতিয়া
৫৬.	হায়দার আলী	ওসমান আলী	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৫৭.	হোসেন আলী	ছমির উদ্দিন	সাতভিটা	হাতিয়া
৫৮.	আব্দুর রহমান	জমির উদ্দিন	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৫৯.	আজর উদ্দিন	ভেলু মামুদ	আঠারো পাইকা	হাতিয়া
৬০.	শমসের আলী	আঃ মালেক	জলঙ্গারকুটি	বুড়াবুড়ি
৬১.	একাব্বর আলী	বাবর আলী	জলঙ্গারকুটি	বুড়াবুড়ি
৬২.	বাহাদ্দি সেখ	খয়বর আলী	বৈরাগীর হাট	হাতিয়া
৬৩.	সোচা সেখ	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৪.	বাবর উদ্দিন	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৫.	বোচা সেখ	বৈরাগী সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৬.	আব্দুল জলিল	বোচা সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৭.	হামেদ আলী	গেদলা সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৮.	বেনছার আলী	যোদ সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৬৯.	আনছার আলী	যোদ সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭০.	মেজার উদ্দিন	আছদ্দি সেখ	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭১.	পাগলা	জোনাবদ্দিন	নচির ভিটা	হাতিয়া
৭২.	আব্দুল জাব্বার	অহর উদ্দিন	হাতিয়া ভবেশ	হাতিয়া
৭৩.	মামুদ আলী	অকর উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
৭৪.	কেছাব উদ্দিন	হামু সেখ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
৭৫.	নেছাব উদ্দিন	কেতাব উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭৬.	হারান সেখ	করিমুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
৭৭.	হায়দার আলী	ফরমান আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৭৮.	আঃ আজিজ	মোহাম্মদ আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৭৯.	আঃ জব্বার	হামিদ আলী	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৮০.	মোজাম্মেল হক	আঃ রহিম	গোয়ালপাড়া	হাতিয়া
৮১.	উমর আলী	জয়নাল সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮২.	বাবর আলী	জয়নাল সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৩.	মোহাম্মদ আলী	হাসেম আলী	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৪.	উমেল সেখ	হজ্জদি সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৫.	মতিয়ার রহমান	নজ্জদি সেখ	সাকারীগ্রাম	হাতিয়া
৮৬.	বাহার আলী	খয়বর আলী	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৭.	জব্বার আলী	জহদ্দি সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৮.	আজাহার আলী	মনিয়া সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৮৯.	মতিউর রহমান	মানিক সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯০.	দুকু সেখ	আমুদ্দি সেখ	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯১.	জয়নুদ্দিন	ছব্বার আলী	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯২.	মংলা সেখ	আজিমুদ্দিন	কুটিরপাড়	হাতিয়া
৯৩.	নওসাদ আলী	আকালু সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৪.	মমেনা খাতুন	উজির আলী	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৫.	বিসাময়ী দাস	জোমা দাস	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৬.	শামুক বর্মন	মাধাই বর্মন	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৭.	সলেয়া সেখ	জনাদ্দি সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৮.	মানিক মিয়া	অমূল্য সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
৯৯.	হোসেন আলী	মনাদ্দি সেখ	মাঝিপাড়া	হাতিয়া
১০০.	মমর উদ্দিন	জয়নাল সেখ	মধ্যগ্রাম	হাতিয়া
১০১.	জমির উদ্দিন	সৈমুদ্দিন সেখ	মধ্যগ্রাম	হাতিয়া
১০২.	এমরান আলী	জয়নাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৩.	মনদ্দি	আজিমুদ্দিন	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৪.	আজুদ্দিন	নছের মামুদ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৫.	নলকু মিয়া	আঃ মালেক	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৬.	হযরত আলী	বেলাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৭.	নাজিমুদ্দিন	জামাল সেখ	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৮.	আম্মার আলী	খয়বার আলী	বকসীপাড়া	হাতিয়া
১০৯.	মোস্তফা	রহিমুদ্দিন	বকসীপাড়া	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১১০.	মিজানুর	ছমতুল্যা	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১১.	লোকমান	নাজিমুদ্দিন	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১২.	মনির	লোকমান আলী	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৩.	আমিনুল	কাবু মামুদ	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৪.	সমশের	কলিমুদ্দিন	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৫.	আতাউর	বছিয়তুল্যা	হাপারভিটা	হাতিয়া
১১৬.	মনিরা সেখ	আবুল কাশিম	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৭.	লাল বাবু	কছের মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৮.	নাছিম উদ্দিন	আঃ ছাত্তার	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১১৯.	আপাস সেখ	কালু সেখ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২০.	আঃ রশিদ	আঃ করিম	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২১.	ইকবাল	খচর মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২২.	তমিজ উদ্দিন	সোনা উল্যা	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৩.	গোপাল উদ্দিন	নাজিম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৪.	হবিবর	মাম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৫.	একাব্বর আলী	ছমতুল্যা	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৬.	মোবারক আলী	ওসমান আলী	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৭.	আলিম উল্যা	তকের মামুদ	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৮.	কাসেম আলী	কছিম উদ্দিন	চর বাগুয়া	হাতিয়া
১২৯.	বাবর উদ্দিন	নাছির মামুদ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩০.	আব্দুর রহমান	আঃ মজিদ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩১.	আলাল হক	গোলজার	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩২.	মফিজ উদ্দিন	দছিম উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৩.	আঃ করিম	আঃ আজিজ	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৪.	ওনাবদ্দি	মজির উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৫.	তকের মামুদ	আলা বক্স	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৬.	নাজমুল	হায়দার আলী	চাকির পাড়	হাতিয়া
১৩৭.	জহির উদ্দিন	জয়নাল উদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৩৮.	গোলাপ উদ্দিন	জয়নাল উদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৩৯.	নায়েব আলী	আলাল হক	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪০.	ছকমল হোসেন	আজুদ্দিন	চন্ডিপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৪১.	আঃ রশিদ	আঃ রহমান	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪২.	নজর আলী	ওসমান আলী	চন্ডিপুর	হাতিয়া
১৪৩.	হযরত আলী	খয়বার আলী	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৪.	এমরান আলী	হাজারী মামুদ	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৫.	এরশাদুল হক	জমির উদ্দিন	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৬.	জালাল উদ্দিন	মোবারক আলী	বকসীগঞ্জ	বুড়াবুড়ি
১৪৭.	আঃ করিম	আঃ রহমান	সাতভিটা	হাতিয়া
১৪৮.	সোলেমান আলী	লোকমান আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৪৯.	এমদাদুল হক	ফরিদুল হক	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫০.	জাহিদুল	ফরমান আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫১.	ওয়ালীউর	কাসেম আলী	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫২.	মাহতাব আলী	আঃ মজিদ	সাতভিটা	হাতিয়া
১৫৩.	এজাজল হক	ফলে মামুদ-২	মিতাইকার	হাতিয়া
১৫৪.	রহিজ উদ্দিন	ফলে মামুদ-২	মিতাইকার	হাতিয়া
১৫৫.	রিয়াজুল হক	কছদ্দি সেখ	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৬.	ফরমান আলী	হোসেন আলী	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৭.	সিদ্দিকুর রহমান	তমিজউদ্দিন	কালীগঞ্জ	হাতিয়া
১৫৮.	বাছের আলী	জামাল উদ্দিন	ভরতবলী	হাতিয়া
১৫৯.	হাবিবুল্যা	জামাল উদ্দিন	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬০.	সেকেন্দার আলী	মজিবর রহমান	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬১.	তছের আলী	ফারাজ উদ্দিন	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬২.	আলাবক্স	জয়নাল	ফুলছড়ী	হাতিয়া
১৬৩.	হারুন মিয়া	ফয়জার আলী	চাঁদপুর	হাতিয়া
১৬৪.	এলাহী বক্স	ফয়জার আলী	চাঁদপুর	হাতিয়া
১৬৫.	দেওয়ান আলী	তরিকুল হক	বালাবাড়ী	হাতিয়া
১৬৬.	ইসমাইল হোসেন	তোজাম্মেল	বদরগঞ্জ	হাতিয়া
১৬৭.	জহুরুল হক	ফরমান আলী	বদরগঞ্জ	হাতিয়া
১৬৮.	রফিকুল ইসলাম	জমির উদ্দিন	কাজীগ্রাম	হাতিয়া
১৬৯.	ফজলু সেখ	একাব্বর আলী	কাজীগ্রাম	হাতিয়া
১৭০.	আজিজল হক	বছির উদ্দিন	বোতলা	হাতিয়া
১৭১.	নজরুল ইসলাম	হজরত আলী	বেলকুচি	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
১৭২.	হেলাল মিয়া	কাসেম আলী	বেলকুচি	হাতিয়া
১৭৩.	দেলবর হোসেন	ছটকু মামুদ	বেলকুচি	হাতিয়া
১৭৪.	তোফায়েল হক	কেচু মামুদ	কাশিপুর	হাতিয়া
১৭৫.	মতিন মিয়া	ছেপাতুল্যা	কাশিপুর	হাতিয়া
১৭৬.	চান্দ মিয়া	জহদ্দি সেখ	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৭.	মতিউল্যা	কলম উদ্দিন	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৮.	উমর আলী	কাশেম আলী	ফতুল্লা	হাতিয়া
১৭৯.	এশার আলী	জহদ্দি সেখ	টোংগার	হাতিয়া
১৮০.	ভেলকা সেখ	আজিমুদ্দিন	টোংগার	হাতিয়া
১৮১.	আসাদুল হক	শহর উদ্দিন	টোংগার	হাতিয়া
১৮২.	ময়েন উদ্দিন	বারু সেখ	টোংগার	হাতিয়া
১৮৩.	মজির উদ্দিন	নেকাত উল্যা	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৪.	আঃ জলিল	মেজার আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৫.	হারুন মিয়া	রহিমুদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৬.	কেথাত উল্যা সেখ	হায়দার আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৭.	আঃ গফুর	বছির উদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৮.	মাদারী সেখ	হাজারী মামুদ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৮৯.	বেলাল হোসেন	কদিমল হক	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯০.	সুকালু মামুদ	তকের মামুদ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯১.	কাল মামুদ	ইছির উদ্দিন	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯২.	সোনা উদ্দিন	সেতর সেখ	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯৩.	লুৎফর রহমান	তকের আলী	চরবান্ডা	হাতিয়া
১৯৪.	নিয়ামত আলী	বছির মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৫.	অছিয়ত উল্যা	ফেতরু সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৬.	জোনাবদ্দি	ফেতরু সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৭.	বাছদ্দিন সেখ	জেলাল উদ্দিন	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৮.	মনিরা সেখ	ধন মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
১৯৯.	শরিতুল্যা	ফুল মামুদ	সোনারপাড়	হাতিয়া
২০০.	উজির আলী	সোনা সেখ	সোনারপাড়	হাতিয়া
২০১.	নবাব আলী	আঃ জলির	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০২.	ব্যাংগু সেখ	তছদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২০৩.	ইসলাম	বাছতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৪.	ওয়াহেদ আলী	বাছতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৫.	সেরু সেখ	হামেদ আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৬.	আমুদ্দিন সেখ	তছদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৭.	লাল মিয়া	হারুন মিয়া	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৮.	ওহাব আলী	আঃ বারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২০৯.	শহর উদ্দিন	ভোলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১০.	শহর মামুদ	আঃ জব্বার	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১১.	ভেলকু সেখ	নাছির মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১২.	জেলাবদ্দি	আলাদ্দি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৩.	আশারু সেখ	বেতারু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৪.	আঃ বাকী	আঃ হাদি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৫.	ফয়জার	জয়নাল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৬.	মনিম	জহদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৭.	মামুন	রহিম উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৮.	খাইরুল	আঃ জব্বার	অনন্তপুর	হাতিয়া
২১৯.	মানিক	ধনিয়া সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২০.	তরিক উদ্দিন	যতির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২১.	বরকত	জেলাদ্দি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২২.	তছরু	আজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২২৩.	আশরাফুল	আঃ গনি	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৪.	কেতরু	আজিজল	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৫.	হেলাল	আজিজল	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৬.	মতিউল্যা	জোনাবদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৭.	নাজির	জোনাবদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৮.	হেসফারী	জামাল উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
২২৯.	হেদল	জামাল উদ্দিন	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩০.	নাছিরুদ্দিন	অহদ্দি সেখ	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩১.	রেজাউল	বদিউজ্জামান	চাকির পাড়	হাতিয়া
২৩২.	মজুর উদ্দিন	আব্দুল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৩.	শহর উদ্দিন	আব্দুল	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৩৪.	মেছের উদ্দিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৫.	সবারত		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৬.	ময়েন উদ্দিন		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৭.	আঃ আজিজ	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৮.	আঃ লতিফ	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৩৯.	আঃ গফফার	আরজুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪০.	আঃ জব্বার	ওসমান আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪১.	মেহের বিবি	ছমত সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪২.	গোলজার	শহর মিস্ত্রি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৩.	আলী সেখ	করমত উল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৪.	মজিবর	আলেফ উদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
২৪৫.	ফকদ্দিন	মালগন্ডি	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৬.	ঝড়ু সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৭.	শরু সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৮.	খাদিম মামুদ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৪৯.	আমিন উদ্দিন	জেনাতুল্যা	নীলকাটি	হাতিয়া
২৫০.	নাজিম উদ্দিন	ফজর চাটু	নীলকাটি	হাতিয়া
২৫১.	সুটকু	মেহের পাগলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫২.	নজির হোসেন	আলে মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৩.	ছাত্তার আলী		অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৪.	দুরলভ		নীলকাটি	হাতিয়া
২৫৫.	নেছাব উদ্দিন		নীলকাটি	হাতিয়া
২৫৬.	খতব উদ্দিন		রামখানা	হাতিয়া
২৫৭.	কছিম উদ্দিন	জেনাতুল্যা	গুজিমারী	হাতিয়া
২৫৮.	এয়াজ উদ্দিন	জেনাতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৫৯.	কাশেম পাগলা	পাগলা ব্যাপারী	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬০.	আজদ্দিন	বাসবুড়া	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬১.	নছিমন	আজুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬২.	মহিজন	কছিমুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৩.	মেহেরজন	এজাবুদ্দিন	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৪.	কান্দুরা	বেংগু ফকির	গুজিমারী	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৬৫.	আনছার	বেংগু ফকির	গুজিমারী	হাতিয়া
২৬৬.	জয়েন উদ্দিন	ময়েন ব্যাপারী	রামখানা	হাতিয়া
২৬৭.	সাহাদুল সেখ	হাজারী মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৬৮.	বাবর উদ্দিন	সাহাদুল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৬৯.	বক্তার আলী	সাহাদুল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭০.	ছোবহান	আলিম	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭১.	কাদের আলী	হেসকারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭২.	ছাবেদ আলী	শরু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৩.	মোহাম্মদ আলী	মেছের আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৪.	পয়জার আলী	ওসমান আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৫.	বানু সেখ	বাবর আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৬.	বক্তার আলী	রজব আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৭.	সংসার আলী	ঠাকাল	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৮.	মশুল সেখ	জহদ্দি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৭৯.	তছলিম উদ্দিন	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮০.	তহফেল হক	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮১.	মোজাম্মেল হক	তয়েন উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮২.	আঃ ছাত্তার	ছলিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৩.	মেজা সেখ	পাগলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৪.	মোজাম্মেল মুন্সি	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৫.	কাশেম আলী	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৬.	এশার আলী	খাদিম সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৭.	মহাদ্দিন	অমতুল্যা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৮.	ইবরা সেখ	শলক ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৮৯.	আজিমুদ্দিন	গেন্দলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৯০.	আব্বাস	গেন্দলা	অনন্তপুর	হাতিয়া
২৯১.	আঃ হাফিজ	আছান আকন্দ	রামখানা	হাতিয়া
২৯২.	ইয়াকুব	মিয়াজদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৩.	পয়জার	আফান সেখ	রামখানা	হাতিয়া
২৯৪.	ফজল সেখ	হাসু সেখ	রামখানা	হাতিয়া
২৯৫.	ছপিয়ল	জহির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
২৯৬.	আজিজল	মহিম	রামখানা	হাতিয়া
২৯৭.	বনিরুদ্দিন	নাজিবুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৮.	গহুর দেওয়ানী	নাছির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
২৯৯.	টেপরী বেগ	মগহুর উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩০০.	কেনছার	মতি সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩০১.	আবুল হোসেন	কেরামত আলী	রামখানা	হাতিয়া
৩০২.	হাবিবুর রহমান	নজিবুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩০৩.	আঃ হাকিম	বাছের সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩০৪.	পাগলা সেখ	কাঞ্চিয়া	রামখানা	হাতিয়া
৩০৫.	করিম বক্স	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩০৬.	রোস্তম	করিম বক্স	রামখানা	হাতিয়া
৩০৭.	আঃ রহমান	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩০৮.	এজা সেখ		রামখানা	হাতিয়া
৩০৯.	মেহের উল্যা	গমির উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১০.	কাচু সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১১.	মাছু সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১২.	আকবর সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১৩.	জব্বার সেখ	মেহের উল্যা	রামখানা	হাতিয়া
৩১৪.	আজুরুদ্দীন	আমিরুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৫.	আঃ ছাত্তার	বাছের সেখ	রামখানা	হাতিয়া
৩১৬.	কাশেম	মহিজ উদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৭.	মজিবর	মিছুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৮.	মজাহার	জহুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩১৯.	শুটকু	বেড়া ভাংগা	রামখানা	হাতিয়া
৩২০.	কলমদী	ক্যাশক	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২১.	মনি সেখ	টুনি মামুদ	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২২.	নৈমুদ্দীন	খৈমুদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৩.	আবুল	আমুদ্দিন	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৪.	জব্বার	কছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৫.	আকবর	কছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৬.	মোস্তাজ	বেংগু	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩২৭.	এমাজ	নজি বুড়া	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩২৮.	আলিফ উদ্দিন	আব্দুল	নীলকাটি	হাতিয়া
৩২৯.	হোসেন	ওসমান	রামখানা	হাতিয়া
৩৩০.	লাল মিয়া	আছুরুদ্দিন	রামখানা	হাতিয়া
৩৩১.	মোহাম্মদ আলী	পোয়াতু মিয়াজী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩২.	শহীদ আবু বক্কর	কালে মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৩.	আজগার আলী	ফজল উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৪.	উমর আলী	মিছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৫.	আজাহার আলী	ফজল উদ্দিন ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৬.	ভেদু সেখ	মিছির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৭.	জবেদ আলী	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৮.	খেরু সেখ	আনছার আলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৩৯.	হযরত আলী	আশরাফ উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪০.	কাজিম উদ্দিন	বাসারতুল্যা ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪১.	কল্পনা বাসপো	ভবিশ বাসফো	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪২.	ইব্রাহীম আলী	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৩.	সমসের আলী	ভাসা মামুদ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৪.	আনছার মানু	আছর উদ্দিন ব্যাপারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৫.	বাবু মিয়া	আপান তেলী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৬.	মহদ্দিন	আকদ্দি শিকারী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৭.	আফজাল হোসেন	হেদল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৮.	আজিত	ভাণ্টু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৪৯.	বাবর আলী	মতি সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫০.	মঙ্গল ঠাকুর	দেবেন ঠাকুর	বোনারপাড়া	হাতিয়া
৩৫১.	আকবর আলী	আকাদ্দ সরকার	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫২.	এলাদ্দিন সেখ	আপতান	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৩.	গেনছার আলী	সজর উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৪.	খচিয়ত উল্যা	জহির উদ্দিন	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৫.	গহুল	টুংসু সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৬.	কপদ্দিন	বৈরাগী	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৭.	খয়বার আলী	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩৫৮.	আহম্মেদ আলী	রুমাল সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৫৯.	কাচুয়া সেখ	পাগলা সেখ	অনন্তপুর	হাতিয়া
৩৬০.	আমুদ্দিন	এছান তেলী	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬১.	ছপর মৌলভী	এছান তেলী	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬২.	আমজাদ আলী	আমিন উদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৩.	আমিন উদ্দিন	হেদেল সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৪.	আপাজ উদ্দিন	ছফর মৌলভী	আইরকাঠি	হাতিয়া
৩৬৫.	আজিমুদ্দিন	হারাধন মামুদ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৬.	আলিমুদ্দিন	আজিমুদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৭.	আঃ জালাল	হায়পুদ্দিন (ভালকা)	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৮.	নেস মামুদ	হারাধন মামুদ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৬৯.	ধনিয়া সেখ	টোরা সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭০.	বাবর আলী	টোরা সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭১.	আজি সেখ	ভাণ্টু সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭২.	আবদাল হোসেন	মিছির উদ্দিন	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৩.	চিনি সেখ	আজিজর সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৪.	নছিয়তুল্যা	মাদু সেখ	চর গুজিমারী	হাতিয়া
৩৭৫.	কাচুয়া সেখ	নেদা তেলী	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৬.	আকতার হোসেন	গাদলু সেখ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৭.	বাহাউল্লা	খতি মিঞাজি	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৮.	আকবার আলী	গেনলা সেখ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৭৯.	ভোলা সেখ	সাজিম তেলি	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮০.	আব্দুল	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮১.	ছমচল	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮২.	এছাহাক	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৩.	ফুকতুল সেখ	ছফর উল্যা	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৪.	নকর আলী	কচের আলী	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৫.	বাহের আলী	ঐ	নয়াডোরা	হাতিয়া
৩৮৬.	মোঃ আবুল হোসেন	খবির উদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৮৭.	আনছার আলী	মতি উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৮৮.	কমর উদ্দিন ব্যাপারী	হাজী মেহের উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া

ক্রম	গণহত্যায় শহীদদের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রাম	ইউনিয়ন
৩৮৯.	কোবান আলী	দেয়ানতুল্যা ব্যাপারী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯০.	আঃ রহমান	রহমতুল্যা ব্যাপারী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯১.	শিশু বাচ্চা	আঃ রহমান	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯২.	সৈয়দ আলী	কচিম উদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৩.	মোছাঃ মোনামাল	করিম উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৪.	মোঃ ফরজ উল্যা	কালে মামুদ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৫.	মোঃ ফারাজ উল্যা	নিশপতুল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৬.	মহির আলী	ফরাজ উল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৭.	মোঃ বিবুরুদ্দি	ঐ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৮.	মোঃ এজাব উদ্দিন	ঐ	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৩৯৯.	মোঃ চান মিয়া	সহির আলী	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০০.	মোঃ মজিবর রহমান	এবারতুল্যা	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০১.	আঃ লতিফ	মসিজুদ্দিন	হাঃ গ্রাম	হাতিয়া
৪০২.	টোনেয়াল	খাদু মামুদ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৩.	আকালু সেখ	খোশে মামুদ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৪.	তমিজ উদ্দিন	পরবাসু	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৫.	আছর উদ্দিন	টোনেয়া সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৬.	দারোপ আলী	বছদ্দিন তেলী	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৭.	আমাদ্দিন	গুগরু সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৮.	মজিবর রহমান	গুগরু সেখ	ভাটিগ্রাম	হাতিয়া
৪০৯.	হফেজ উদ্দিন	পরবাসু	শ্যামপুর	হাতিয়া
৪১০.	আব্দুর রহমান	আরিফ উদ্দিন	হিঃ গোপপাড়া	হাতিয়া
৪১১.	শরফেন বেওয়া	ধনাই	মালচার পাড়	হাতিয়া
৪১২.	আঃ জব্বার	অহদ্দি সেখ	মালচার পাড়	হাতিয়া
৪১৩.	লোকমান হোসেন	সৈয়দ আলী মুন্সী	কাকড়িরচর	হাতিয়া
৪১৪.	হাছিম সরদার	বাবন সরদার	কাকড়িরচর	হাতিয়া

(অসম্পূর্ণ)

ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতদের তালিকা

হাতিয়া গণহত্যায় নির্যাতিত এবং সে সময় ঐ এলাকায় অবস্থান নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা অনেকে এখনও জীবিত আছেন। এ গণহত্যায় যারা শহীদ হয়েছিলেন এবং যারা নির্যাতিত তারা বেশিরভাগই দাগারকুটি, অনন্তপুর, কুটির পাড়, হিজলি গোপপাড়া ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে অধিবাসী। এই গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি ও এই গণহত্যা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার থেকেই ভুক্তভোগী ও নির্যাতিতের নিম্নোক্ত চিত্রটি পাই :

ক্রম	নাম	পিতা/স্বামী	গ্রাম	বিবরণ
১.	মোঃ বাবর আলী	মোঃ আনসার আলী	অনন্তপুর	পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা গুলিবিদ্ধ
২.	শাহের আলী	মোঃ আনসার আলী	অনন্তপুর	পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা গুলিবিদ্ধ
৩.	মোঃ সুলতান আলী	মৃত ওছিমুদ্দিন	অনন্তপুর	শারীরিকভাবে লাঞ্চিত
৪.	মোঃ কামালউদ্দিন	শহীদ বাবর উদ্দিন	রামরামপুর	নিজ পিতা শহীদ ও নিজে গুলিবিদ্ধ
৫.	জরিনা বেওয়া	পয়জার আলী	রামখানা	স্বামী নিহত
৬.	ময়জন বেওয়া	আলীমুদ্দিন ব্যাপারী	নীলকণ্ঠ	স্বামী নিহত
৭.	ফজিলা বেওয়া	জোবেদ আলী	অনন্তপুর	স্বামী নিহত
৮.	একাব্বর আলী	হযরত আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত
৯.	রোকেয়া বেগম	হযরত আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত
১০.	ফজলু হক	জাবেদ আলী	অনন্তপুর	পিতা নিহত

(অসম্পূর্ণ)

নির্যাতিতদের মৌখিক ভাষ্য

মোঃ বাবর আলী (৮৫)

পিতা : মোঃ আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ বাবর আলী

ঐদিন ছিল শনিবার। ভোরবেলা প্রচুর গোলাগুলি ও মানুষের চিৎকারে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি অনন্তপুর বাজার ও গ্রামের বাড়িঘরে খানসেনারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধরছে এবং মারপিট করছে এবং গুলি করে মারছে। আমি মাসহ পালাতে চেষ্টা করি। আমরা বাড়ির পাশের ঝোঁপে লুকানোর চেষ্টা করি। মা আমাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখেন। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাই এবং তারা আমাকে মারধর শুরু করে। আমাদের বাড়িতে তখনও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পোস্টার ছিল। নৌকা মার্কা পোস্টারগুলো ওরা ছিঁড়ে ফেলে ও পুড়িয়ে দেয়। আমার ঘরে তখন বাঁধাই করা তিনটি ছবি ছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শেখ মুজিবের ছবি। খানসেনারা শেখ মুজিবের ছবিতে গুলি করে ঝাঁঝড়া করে দেয় ও মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে লাথি মারতে থাকে। আর বাকি দুটো ছবি ওরা নিয়ে যায়। ওরা আমাকে গুলি করে এবং তা আমার শরীরের তিনটি স্থানে লাগে। কিন্তু তিনটি গুলি খাওয়ার পরও আমি বেঁচে আছি। গুলি লাগার পর অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি হাসপাতালে। আমাকে কুড়িগ্রামে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এদিকে আমাদের বাড়িঘর, দোকানপাট, গরু-বাছুর সব কিছু ওরা পুড়িয়ে

গণহত্যা ১৯৭১

এবং লুট করে শেষ করে দিয়ে যায়। আমার জীবিত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আমাদের পরিবারের ঐ সাতটি লাশের কবর দেওয়ার সাথে সাথে আমার জন্যও একটা কবর খুঁড়ে রাখে। কারণ, আমার যা অবস্থা ছিল সেখান থেকে বেঁচে আসাটা ছিল অকল্পনীয়। যাহোক, তারপর থেকেই আমি অসুস্থ এবং প্রায় পঙ্গু।

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে ঠেলা গাড়ি
ভাস্কর্য, লোহা

মোঃ শাহের আলী (৭৫)

পিতা : মৃত আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : পুরাতন অনন্তপুর বাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

পেশায় কৃষিজীবী এই সহজ সরল প্রকৃতির মানুষটি সেদিনের বীভৎসতার আতংক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। একই পরিবারের সাতজনকে হারিয়ে এবং পাকিস্তানি বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারের শিকার এই মানুষটি এখন নিস্তেজ প্রায়। ঐদিন ভোর থেকে প্রায় আসরের আজান পর্যন্ত চলা গণহত্যা ও নির্যাতনের প্রায় পুরো সময়টা জুড়ে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আটক ছিলেন এবং নির্যাতিত হন। ছোটখাট এই মানুষটি স্বচক্ষে দেখেছেন সেই নারকীয় গণহত্যা। শাহের আলীর বর্ণনায় :

একাত্তরে আমি একজন কৃষক ছিলাম। ভোরবেলা গুলির আওয়াজে ঘর থেকে বের হয়ে যেই রাস্তায় যাই, দেখি পাকিস্তানি বাহিনী সব ঘরে আগুন দিচ্ছে ও যাকে সামনে পাচ্ছে মারধর করছে। যারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তাদের গুলি করে মারছিল। এসব দেখে আমি ভয়ে নদীর দিকে দৌড়াতে থাকি। কিন্তু ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাকে পেটাতে থাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল,

মোঃ শাহের আলী

তুম মুক্তি? কিউ পালাতে হো? মুক্তি কিধার? আমার বুকে, মুখে, পিঠে ওরা বুটদিয়ে লাথি মারতে থাকে। এদিকে আমার চোখের সামনেই ওরা অনেককে গুলি করে মেরে ফেলে। তারপর আমাকে ধরে নিয়ে যায় দাগারকুটি। ওখানে আরও বহু লোকজনকে ধরে নিয়ে আসে। ওখানে পাশের গ্রামের অনেক মানুষ ছিল। আমাদের সবাইকে ধল্লা (ধরলা) নদীর কাছাকাছি একট ঢালু জায়গায় লাইন করে দাঁড় করায়। আবার আমাকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে আসে ও আবার মারপিট করে অন্য একটি সৈন্যদের দলের হাতে ছেড়ে দেয়। এভাবে প্রায় বিকাল ৪টা-৫টা পর্যন্ত ধরে রাখে ও মারপিট করে। ওরা আমার বাম পায়ে একটা গুলি করেছিল। আমাকে এত মারধর করার ফলে এক সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমি হাসপাতালে। নিজের চোখে দেখেছি ওরা কমপক্ষে তিনশ-চারশো মানুষকে শুধু দাগারকুটিতেই গুলি করে মেরেছে। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। যুদ্ধের পর থেকেই আমি অসুস্থ। আমার এক পাশ পড়ে গিয়েছে (প্যারালাইজ্‌ড)। আমার শরীরে এখনও যন্ত্রণা হয়।

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে গাড়ি
ভাস্কর্য, মিশ্র মাধ্যম

মোঃ কামাল উদ্দিন (৬০)

পিতা : শহীদ বাবর উদ্দিন, গ্রাম : রাম রাম পুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

মোঃ কামাল উদ্দিন

মোঃ কামাল উদ্দিন যুদ্ধের সময় ১৫ বছরের একটি কিশোর। ঐসময় তাদের বাড়ি ছিল অনন্তপুর গ্রামের কুটিরপাড়, যা এখন ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে বিলীন। পাকিস্তানি বাহিনীর হাতিয়া অপারেশনে

কামাল উদ্দিনের পিতা শহীদ হন এবং তাদের পরিবারের আরও অনেকে শহীদ ও নির্যাতিত হন। কামাল উদ্দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত। তাঁর শরীরে এখনও পাঁচটি গুলির চিহ্ন বিদ্যমান। ঐদিনের নৃশংসতা, নির্যাতন ও ভয়াবহতার স্মৃতিচারণে কামাল উদ্দিন বলেন :

তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। পাকিস্তানি আর্মি গ্রামের মধ্যে ঢুকে বাড়িঘর, দোকানপাট, গোয়ালঘর, খড়ের গাদা সবকিছুতেই আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাণভয়ে আমি নদীর দিকে দৌড়াতে থাকি। কিন্তু আমি ওদের হাতে ধরা পড়ে যাই। ওরা আমাকে বেদম পেটাতে আরম্ভ করে। আমি কান্নাকাটি করছি আর আমাকে ওরা আরও মারছে। বুট দিয়ে মুখে লাথি মারলে আমার নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে যায়। এরপর ওরা আমাকে নিয়ে যায় ধল্লার (ধরলা) কাছে দাগারকুটি গ্রামে। ওখানে অন্যান্য গ্রাম থেকেও অনেককে ধরে এনেছিল। তারপর আমাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। আমরা প্রায় সাতশ-আটশ লোক ছিলাম। তারপর ওরা আমাদেরকে গুলি করে। এতে অনেক মানুষ, প্রায় চারশ হবে, মারা যায়। এরপরও ওরা অনেককে গুলি করে মারে। যারা গুলি খেয়েও বেঁচে ছিল এরকম অনেককে খানসেনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। খান সেনাদের এই আক্রমণে আমার বাবা, মামাসহ আমাদের পরিবারের ছয়জন সদস্য সেদিন নিহত হয়। সেদিনকার নির্যাতন ভুলে যাওয়ার মত নয়। নদীভাঙনের ফলে ঐ গ্রাম (দাগারকুটি) আর নেই এবং আমাদের গ্রামের (কুটির পাড়) লোকজনও সব বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে।

মোঃ সুলতান আলী (৫৮)

পিতা : মৃত ওছিমুদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ ব্যবসাঘর, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫।

মোঃ সুলতান আলী হাতিয়া গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং নির্যাতিত ব্যক্তি। ১৯৭১ সালে পনের বছর বয়সী একজন কিশোর হিসেবে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা ও বর্বরতার যে চিত্র স্বচক্ষে দেখেছেন তার বিবরণ দিলেন এভাবে :

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১ আমি আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনন্তপুর বাজারে রাত্রে ছিলাম। ভোর বেলা পশ্চিম দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হঠাৎ করে গুলি করে। ঐ শব্দ শোনার পর ঘুম থেকে

জেগে উঠি। দোকানের বাইরে এসে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি পাকিস্তানি সেনারা বাজারের নিকটে এসে গেছে। এমন অবস্থায় আমি দোকানে তালা লাগিয়ে বাজারের পূর্বে আমাদের বাড়িতে চলে যাই এবং সবাইকে এই খবর দিই। সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই। পরে আমি আমার বই-পুস্তক ও আমার কাছে থাকা বাংলাদেশী পতাকা একটি ট্রাংকের মধ্যে নিয়ে বাড়ির কাছেই একটি গর্তের মধ্যে লুকাই। এরই মধ্যে আমি শুনতে পাই অনন্তপুর বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী বলছে, জ্বালাও, আগ লাগাও, কাহাছে মুক্তি, খোঁজো। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের বাড়ির মধ্যে চলে আসে এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর বলতে থাকে কাহাছে মুক্তি, খোঁজো, আগ লাগাও। আমি প্রাণের ভয়ে ঐ গর্ত থেকে উঠে বাড়ির পূর্ব দিকে দৌড় দিই। বৃষ্টির মতো গুলি করতে থাকে ওরা। আমি ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে যাই। পরে ওখান থেকে উঠে পাশেই আমার এক চাচার বাড়িতে দরজার পিছনে গিয়ে লুকাই। ওখান থেকে আমি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ি। আমাকে নিয়েই ওরা বামনি নদীর পাশে মাস্টারের বাড়ির কাছে নিয়ে যায় এবং ওখানে সবাই এক হয়ে প্রচুর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে এবং আশেপাশে যাকেই পেয়েছিল তাকেই গুলি করে মেরে ফেলে। ওখানে বসে থাকাকালীন ওরা আমার গলায় গ্রেনেড ঠেকায় এবং অন্য খানসেনা আমার গলায় বন্দুকের নল ধরে রাখে। কিন্তু গুলি করে নি। অন্যরা আমাকে বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে যেমন, কাহাছে মুক্তি হ্যায়, কিধার রেহেতা হ্যায়, কখন আসে, কী রকম অস্ত্র নিয়ে আসে। আমি যতটুকু পারি কৌশলে উত্তর দিতে থাকি। তা আমাকে ওরা বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। ওরা অপারেশন শেষ করে চলে যাবার আগে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি বাড়ির দিকে রওনা দিই।

মোঃ সুলতান আলী

বৃদ্ধ মাকে নিয়ে শরণার্থী হিসেবে দেশ ত্যাগ

এমন সময় আমাদের মুক্তিবাহিনী দক্ষিণ দিক থেকে গুলি ছুঁড়লে তিনজন খান সেনা নিহত হয়। পরে পাকিস্তানি বাহিনী যখন দক্ষিণ দিকে রওনা দেয় তখন আবার ওদের হাতে ধরা পড়ি। ওখান থেকে ওরা আমাকে কৈলাশের ভিটা, হাতিয়ার বিল পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। সেখানে ওরা আমাকে চড় মারে এবং বুট দিয়ে আমার মুখে লাথি মারে। তারপর ওরা আমাকে দাগারকুটি গ্রামে ধরে নিয়ে যায়। ওখানে কিছু রাজাকারও ছিল যেমন, সাইদুর মাওলানা, আকবর, আরো অনেকে। ওখানে আমাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাখে এবং কিছুক্ষণ পর বসন্ত ও প্রশান্ত কবিরাজের বাড়ির পাশে নিয়ে যায়। ঐ বাড়ির পাশে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনা লোকজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায়। আমাকে প্রথম যারা ধরেছিল, তারা বলে মাত ঘাবড়াও, ছোড় দেগা। এখানে সব খানসেনা উপস্থিত ছিল। ধরে আনা লোকজনের মধ্যে আমার বাবা ও এক চাচা শাহের আলীও ছিলেন। পাকিস্তানি বাহিনী ওদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করে। কমপক্ষে তিন-চারশো লোক এখানে শহীদ হন। আমাকে ওরা ধরে নিয়ে লালমনিরহাটের দিকে রওনা দেয়। পরে রাস্তার মধ্যে আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখি সব কিছু শুধু ছাই হয়ে পড়ে আছে। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছি। এরপর আমার বাবা ফিরে আসেন। আমি ও আমার বাবা এবার খুঁজতে বের হই পরিবারের অন্যরা কে কোথায় আছে তা জানার জন্য। এমন সময় নদীর ধারে দেখি আমার এক চাচা বাবর আলী তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে 'গ্যাংড়াইতেছেন' এবং পানি পানি বলে চিৎকার করছেন। আমরা তাকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি করি। এই আক্রমণে আমাদের সাতজন আত্মীয়-স্বজন শহীদ হন। আমি যে বেঁচে আছি, এটা মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই। বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারা কুকুর শেয়ালের মত মানুষ মারছে। চোখের সামনেই এই বিরাট গণহত্যা আমাকে সব সময় কষ্ট দেয়। সরকার যে বিচার করছে (যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার) সেখানে এখানকার দালালদের বিচার করা হোক।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য

মোঃ মনসুর আলী

মোঃ মনসুর আলী (৬০)

পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ মনসুর আলী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি খায়রুল আলম কোম্পানির সাথে উলিপুরের বিভিন্ন স্থানে, চিলমারী, দুর্গাপুরসহ এতদ্ অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানে অংশ নেন। তাদের কোম্পানির একটি গ্রুপের দুটো ক্যাম্প ছিল নতুন অনন্তপুর গ্রামের বছির ব্যাপারী ও আজিমুদ্দিন সরকারের বাড়িতে। পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের হাতিয়া অপারেশনের সময় তিনি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই নিরাপদ অবস্থানে চলে যান। পাকিস্তানি বাহিনী অপারেশন শেষ করেই চলে যাওয়া মাত্রই তিনি দাগারকুটি ও অনন্তপুর গ্রামে আসেন। সেই ভয়াল অভিজ্ঞতা তাঁর নিজ বয়ানে:

একাত্তরের শরণার্থী

আমার বয়স তখন ১৬ বছর। আমি অনন্তপুর, দাগারকুটি গ্রামের কিছু দূরে মধুপুর গ্রামে অবস্থান করছিলাম। স্থানীয় রাজাকাররা মূলত আমাদেরকে (মুক্তিযোদ্ধাদের) মারার জন্যই পাকিস্তানি বাহিনীকে ডেকে আনে। আমি দূর থেকে ওদের অস্ত্রশস্ত্র দেখেছি। পাকিস্তানি বাহিনী অনন্তপুর বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পর আশপাশের বাড়িঘরেও আগুন ধরিয়ে দেয় এবং বেশ কয়েকজনকে ওখানেই হত্যা করে। পাকিস্তানি বাহিনীর একটি গ্রুপকে টার্গেট করে শওকত ভাইরা (মুক্তিযোদ্ধা দল) দক্ষিণ দিক থেকে গুলি ছুঁড়লে তিনজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর এরা পাগলা

কুত্তার মতো এলাকার সাধারণ জনগণকে হত্যা করতে শুরু করে। অনন্তপুর, দাগারকুটিসহ আশপাশের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে এরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য গ্রামবাসীদের ধরে দাগারকুটি গ্রামে নিয়ে আসে। এই কাজে স্থানীয় রাজাকার বাউরাত আলী, শহিদুর মাওলানা, আব্দুল মজিদ, শাহজাহান, আকবর আলীসহ অনেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে। যে গ্রামে নিয়ে (দাগারকুটি) সাধারণ জনগণকে হত্যা করা হয় ঐ গ্রামটিতে অনেক রাজাকার ছিল। এই রাজাকারদের সহায়তা নিয়ে ধরে আনা গ্রামবাসীদেরকে সারি করে দাঁড় করিয়ে খানসেনারা ব্রাশফায়ার করে হত্যা করে।

হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পরপরই আমি এলাকায় ঢুকি। দেখি শুধু লাশ আর লাশ। বাড়িঘর, দোকাপাট সব আগুনে পোড়া। যেসব লাশকে তাদের পরিবারের লোকেরা চিনতে পেরেছে সেগুলোর কবরের ব্যবস্থা হয়েছিল আর বাকিগুলো কবরস্থ করা সম্ভব হয়নি। একই গর্তে অনেকগুলো করে লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। অনেক লাশ ধরলার পানিতে ভেসে যায়। আমি হাতিয়া গণহত্যায় শহীদদের তালিকা সংগ্রহের কাজে ৬৯৭ জন শহীদের তথ্য পাই।

তথ্য সংগ্রহকারীর ভাষ্য

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫)

পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫।

১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে তিনি ৬নং সেক্টরাধীন দিনাজপুর, পঞ্চগড় অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। দেশ স্বাধীন হলে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং তারপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে হাতিয়া গণহত্যা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের কাজ শুরু করেন। একটানা ২২ বছর ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করা নিবেদিতপ্রাণ এই মুক্তিযোদ্ধার ভাষ্য :

যুদ্ধ শুরু হলে স্থানীয় ডা. বাবর আলী, মনসুর আলী, মাওলানা আকবর, শহিদুর মাওলানা, আব্দুল মজিদ প্রমুখ এপ্রিল মাসের শেষ দিকে অনন্তপুর বাজারে একটা সভা করে। সভায় উপস্থিত সবাইকে গরু জবাই করে খাওয়ানো হয়। এই সভাতেই ডা. বাবর আলীকে প্রধান করে হাতিয়া ইউনিয়ন শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। তারা এলাকার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হুকুম দেয়। যদি কেউ কথা না শোনে তবে তাকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দিতে থাকে। কিন্তু, হাতিয়ার মানুষ তাদের কথার তোয়াক্কা করে নি। শুধু এই হাতিয়া ইউনিয়নেই তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬৩ জন। তালিকার বাইরেও বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আছেন। এই ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি ক্যাম্প ছিল মুক্তিবাহিনীর এবং হাতিয়াবাসীও মুক্তিযোদ্ধাদের সাধ্যমত সহযোগিতা করেছে। এ বিষয়টি স্থানীয় রাজাকার, দালালদের জন্য খুব মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তারা একটা উছিলা খুঁজছিল। এর মাঝে উলিপুর থানার পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প থেকে একদল পাকিস্তানি সেনা ও শান্তি কমিটির লোকজন অনন্তপুর বাজারে এসে স্থানীয় লোকজনকে একত্র করে একটা মিটিং করে। মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকে, নদীর ওপাড় থেকে কিভাবে আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধারা দুর্গাপুরের ব্রিজ নষ্ট করে দেয়, উলিপুর হানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করে, বালারহাট ও মণ্ডলারহাটে খানসেনাদের মোকাবিলা করে। এই সুযোগে যারা শান্তি কমিটির স্থানীয় বড় ধরনের দালাল ছিল, তারা এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য উলিপুরে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে যোগাযোগ করে।

সেদিন ছিল ২৭ রমজান, ১৩ নভেম্বর। ভোরবেলা খান সেনারা ও রাজাকার, দালাল একসাথে অনন্তপুর বাজারে চলে আসে। বাজারে ও আশপাশে তারা যেসব গ্রামবাসীকে পাই, তাদেরকে

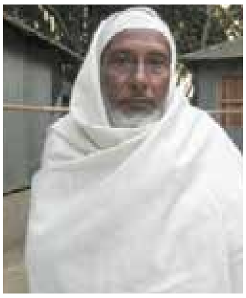

মোঃ মিজানুর রহমান

হামিদুজ্জামান খান
একাত্তর-এর স্মরণে দরজা
ভাস্কর্য

মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ দিতে বলে। যারা উত্তর দিতে পারেনি, তাদের অনেককে ওরা দাগারকুটি গ্রামে ধরে নিয়ে হত্যা করে। এছাড়া অনেককে বেদম পেটায়, বিশেষ করে নবীনদের। এরই মধ্যে আমাদের গ্রামের একজন মুক্তিযোদ্ধা আবু বকর খানসেনাদের হাতে ধরা পড়ে। আবু বকর তাঁর বাবা-মার সাথে দেখা করতে এসেছিল আগের দিন রাতে। খানসেনারা প্রথমে ওদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওকে প্রচুর মারপিট করার পর ওর বাবা-মার সামনে হাত-পা বেঁধে ঐ আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা তিনদিক থেকে গুলি করতে আরম্ভ করলে তিনজন খানসেনা নিহত হয়। এরপর পাকিস্তানি সেনারা ঐ তিনদিকের গ্রামগুলোর মধ্যে ঢুকে যাকে পেয়েছে তাকেই ধরে নিয়ে যায় দাগারকুটি গ্রামে। এখানেই সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়। তারপর ব্রাশফায়ার করে ওদের উপর। এখানেই প্রায় চারশো গ্রামবাসী শহীদ হন। যারা গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়েছিল, তাদের অনেকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। এই গণহত্যা নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছি যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজাকার মিলে দাগারকুটি গ্রামে ও আশপাশের গ্রামগুলোতে ৬৯৭ জনকে হত্যা করে। এসব মৃতদেহের একটা বড় অংশের কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি। কবর দেওয়ার জন্য যে আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র কাপড় লাগে তা আশেপাশে পাওয়া যায়নি। ওরা সবকিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। একই দিনে মণ্ডলারহাটে হামিদ মাওলানার রাজাকার দল চারজন মুক্তিযোদ্ধাকেও হত্যা করে। পুরো অঞ্চল জুড়ে শুধু রক্ত, লাশ আর হাহাকার ছিল। এখানে বেশিরভাগ লাশকে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছিল। অনেক লাশ ধরলার পানিতে ভেসে যায়।

সংরক্ষণ প্রয়াস

দীর্ঘদিন পর্যন্ত হাতিয়া গণহত্যার স্মৃতি সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। প্রথমদিকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মিজানুর রহমানের সাথে বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত পরিবারের কিছু সদস্য ১৩ নভেম্বর দাগারকুটি বধ্যভূমিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতেন। ১৯৮২ সালে বেসরকারি সংস্থা প্রশিকা সর্বপ্রথম এই স্মৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায়। কমান্ডার মিজানুর রহমান, মোঃ মনসুর আলী, মোঃ শামসুল আলমসহ বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার উদ্যোগে হাতিয়া গণহত্যায় শহীদ ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়নের যে কার্যপ্রচেষ্টা চলছিল, তা আরও গতিশীল হয় এই উদ্যোগের সাথে প্রশিকার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে।

প্রশিকা কর্মকর্তা আবু সাঈদ এবং পূর্বোল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে হাতিয়া গণহত্যায় শহীদ এমন ৬৯৭ জনের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, ১৯৮৫ সালে দুর্বৃত্তরা প্রশিকার উলিপুর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করলে শহীদদের ঐ তালিকাটি পুড়ে যায়। আবু সাঈদের সহযোগিতায় দাগারকুটি বধ্যভূমিতে প্রথমবারের মতো একটি স্মৃতি স্থাপনা নির্মিত হয়। কিন্তু নদীভাঙনের ফলে দাগারকুটি গ্রামের সাথে স্মৃতি স্থাপনাটিও বিলীন হয়ে যায়। তারপর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মিজানুর রহমানসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা ও বেশকিছু তরুণ চাঁদা তুলে হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয়ের পাশে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও সংস্কারের অভাবে এটির জীর্ণদশা স্থানীয় শহীদ পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে কষ্ট দেয়। এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

অনন্তপুর বাজার সংলগ্ন জেলা পরিষদ নির্মিত হাতিয়া শহীদ স্মৃতি ফলক

অবশেষে ২০০৬ সালে স্থানীয়ভাবে আয়োজিত 'হাতিয়া গণহত্যা দিবস'-এর আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক একটি স্মৃতিফলক নির্মাণের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন যে, কেউ ভূমিদান করলে তিনি অতিসত্তর একটি স্থাপনা নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেবেন। এ ঘোষণা আসার পর কমান্ডার মিজানুর রহমান অনন্তপুর বাজার সংলগ্ন নিজ জমির দুই শতক পরিমাণ জমি স্মৃতিস্থাপনার জন্য

দান করেন। ঐ জমিতেই জেলা পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সালে একটি স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এই স্মৃতিফলকটি গণহত্যার প্রধান স্মৃতিচিহ্ন।

প্রতিবছর ১৩ নভেম্বর এখানে হাতিয়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে, আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এখনও পর্যন্ত মূলত স্থানীয় উদ্যোক্তারা হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তার এই দিনটি পালন করে থাকেন। তবে সম্প্রতি হাতিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিএম আবুল হোসেনের প্রচেষ্টায় উপজেলা ও জেলা প্রশাসনও ইতিবাচক সাড়া প্রদান করছে। সাম্প্রতিককালে বেশকিছু গণমাধ্যম হাতিয়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে প্রতিবেদন ও প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছে। তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়ভাবে এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ অঞ্চলের মানুষের দাবি, হাতিয়া গণহত্যা দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হোক এবং এই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য পাঠাগার নির্মাণ, সরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ও রাস্তাঘাটের নাম শহীদের নামে নামকরণ ও নৃশংস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষতিগ্রস্ত শহীদ পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকা'র উলিপুর শাখা স্বাভাবিক সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আশির দশকের শুরুতেই হাতিয়া গণহত্যায় শহীদানের তালিকা প্রণয়নের কাজে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে প্রশিকা'র উলিপুর কার্যালয়ও এ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিল এর পুনর্বাসন কার্যক্রম। হাতিয়া গণহত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রথমে প্রশিকার পক্ষ থেকে চাল বিতরণ করা হয়েছিল। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত কিছু নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। কিন্তু, এই ধরনের সাহায্য দীর্ঘমেয়াদে তেমন কার্যকরী হবে না ভেবে প্রশিকার শাখা কর্মকর্তা আবু সাঈদ আরও চেষ্টা চালাতে লাগলেন। মূলত তাঁরই পরিকল্পনায় প্রশিকা হাতিয়া অপারেশনে ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে গৃহ নির্মাণসামগ্রী বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, সাঈদ ভাই ব্যক্তিগতভাবেও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন। এসব কাজের জন্য প্রশিকা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু, এই জনপ্রিয়তা স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে ভীত করে তোলে। তারা ষড়যন্ত্র করে ১৯৮৫ সালে প্রশিকার উলিপুর কার্যালয় ভস্মীভূত করে।

বর্তমান অবস্থা

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বরে দাগারকুটিতে সংঘটিত গণহত্যার মতো দাগারকুটি গ্রামটিও আজ একটি স্মৃতি। ধরলার তীরবর্তী দাগারকুটি আজ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেই ধরলা নদীও আজ আর ওখানে নেই। ব্রহ্মপুত্র নদ ধরলাকে গ্রাস করেছে এবং কুড়ের পাড় গ্রামটিও আজ প্রায় বিলীন। এই গ্রামগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ অধিবাসী বিভিন্ন স্থানে (উলিপুর, কুড়িগ্রাম, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি) ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। ফলে, তৎকালীন কোন স্মৃতিচিহ্ন বা শহীদদের ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

মূল্যায়ন

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন রচিত *ইতিহাস দখলের ইতিহাস* গ্রন্থ ও তাঁর বিভিন্ন লেখায় এদেশে ইতিহাসের উপাদান ধ্বংসের সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস বিমুখ প্রজন্ম তৈরি করার নীলনকশা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু, অন্তিমে সে গুড়েবালি। ইতিহাস তার নিজ গতিতেই ফিরে আসে, আসবে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে হাতিয়া গণহত্যার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমত, হাতিয়া গণহত্যা সংঘটিত হয় রাজাকার অধ্যুষিত দাগারকুটি গ্রামে। দ্বিতীয়ত, গণহত্যা সংঘটনকারী হিসেবে পাকিস্তানি বাহিনীকেই চিহ্নিত করা হয়। তৃতীয়ত, এই গণহত্যা আকস্মিকভাবে সংঘটিত। গ্রামবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা নির্বিচার গণহত্যার শিকার হয়। চতুর্থত, এই গণহত্যায় সীমাহীন নৃশংসতা পরিলক্ষিত হয়। প্রায় দশ ঘণ্টাব্যাপী এই বিরাট গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ। পঞ্চমত, এই গণহত্যায় কোনো বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী নয়, বরং বাঙালি নিধন ছিল মূল লক্ষ্য। গণহত্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আরো রয়েছে– ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা যখন সিয়াম সাধনার জন্য সেহরি খেয়ে উঠেছে, তখনই পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে। এই হচ্ছে এদের ধর্মপরায়ণতার নমুনা।

১৯৭১ সালের ১৩ নভেম্বর হাতিয়াবাসীর জন্য অভিশপ্ত দিন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরতার শিকার এই গ্রামগুলোর অধিবাসী প্রতিনিয়তই সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারগুলো সেই ধকল আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নির্যাতনের শিকার বা অন্যভাবে ভুক্তভোগী বা প্রত্যক্ষদর্শী কেউ নারী নির্যাতন নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে নারাজ। ধারণা করা হয়, এ বিষয়টি তারা ভুলে যেতে চান।

হাতিয়া গণহত্যা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের অভাবে এই অঞ্চলের সব পর্যায়ের মানুষকে আঘাত করেছে। এ অঞ্চলে এখনও সেইসব রাজাকার ও দালাল এবং তাদের বংশধর ও বশংবদরা বেশ প্রভাবশালী। তারা আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক চাওয়া, হাতিয়া গণহত্যার সাথে যারা জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের মাধ্যমে বিচার করে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

মুক্তিযুদ্ধ ও হাতিয়া গণহত্যা এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষ করে প্রবীণদের মধ্যে প্রতিদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু দৃশ্যমান স্থাপনার অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের অভাব ও সরকারি উদাসীনতার ফলে এলাকার নবীন প্রজন্ম এই আত্মত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। যারা নিজ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানে না, তারা মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস জানবে, এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা বাতুলতা বৈ কিছু না। তাই, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা ও আদর্শ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া সময়ের জোরালো দাবি। এ দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে ঐতিহাসিকভাবেই ইতিহাস বিমুখ বাঙালি জাতি নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে।

তথ্যপঞ্জি

গ্রন্থ

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

হারুন হাবীব (সম্পা.), *বাংলাদেশ : ১৯৭১ গণহত্যা প্রতিরোধ স্বাধীনতা*, ম্যাগনাম ওপাস, ঢাকা, ২০০০

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩

শফিউদ্দিন তালুকদার, *একাত্তরের গণহত্যা যমুনার পূর্ব-পশ্চিম*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩

এ এস এম সামছুল আরেফিন (গ্রন্থনা ও সম্পাদনা), *রাজাকারদের তালিকা বৃহত্তর রংপুর জেলা*, বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা, ২০০৯

সাক্ষাৎকার

মোঃ বাবর আলী (৮৫), পিতা : মোঃ আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ শাহের আলী (৭৫), পিতা : মৃত আনসার আলী, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : পুরাতন অনন্তপুর বাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ কামাল উদ্দিন (৬০), পিতা : শহীদ বাবর উদ্দিন, গ্রাম : রাম রাম পুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

মোঃ সুলতান আলী (৫৮), পিতা : মৃত ওছিমুদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাক : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ ব্যবসাঘর, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫

মোঃ মনসুর আলী (৬০), পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫), পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

মোঃ শামসুল আলম (৬২), পিতা : মৃত মনির উদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : অনন্তপুর বাজার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৫

বিএম আবুল হোসেন (৩৬), পিতা : মৃত বাদশা মিয়া, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ : হাতিয়া ইউনিয়ন কার্যালয়, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০১৫

ঋণস্বীকার

মোঃ মিজানুর রহমান (৬৫), পিতা : মোঃ আছির উদ্দিন সরকার, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ মনসুর আলী (৬০), পিতা : মৃত শরাফউদ্দিন, গ্রাম : হিজলি গোপপাড়া, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ শামসুল আলম (৬২), পিতা : মৃত মনির উদ্দিন, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

বিএম আবুল হোসেন (৩৬), পিতা : মৃত বাদশা মিয়া, গ্রাম : অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

মোঃ আলামিন সরকার (আপন), পিতা : মোঃ আঃ ছামাদ, গ্রাম : বাগুয়া অনন্তপুর, ডাকঘর : বাগুয়া, ইউনিয়ন : হাতিয়া, উপজেলা : উলিপুর, জেলা : কুড়িগ্রাম

তথ্যসূত্র

[১] Kalyan Chaudhuri (1972), Genocide in Bangladesh. London. Orient Longman, PP. 199-2002

[২] সমাজ নিরীক্ষণ পত্রিকা, সংখ্যা ৭০, *রাও ফরমান আলী : পাকিস্তানি জেনারেল ও ১৯৭১*, মুনতাসীর মামুন, পৃ. ৬৯।

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬

[৪] *ঐ*, *পৃ.৭৫*